ভারতীয়

বেদভিত্তিক সাম্যবাদ

(প্রথম খণ্ড)

ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী

সন্তান দল
১৫৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭

প্রকাশক—সন্তান দলের পক্ষে
শ্রীঅসীম বসু

প্রথম প্রকাশ—নববর্ষ, ১৩৩৭

মুদ্রক—শ্রীসাগর সরকার
এস্. বি. প্রিণ্টার্স্
২ই, কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা-১৯

—উৎসর্গ—

যুগ-অধ্যাত্ম-সূর্য মহান ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সংকলিত বাণীর এই পুস্তিকাটি আগামীকালের দেশপ্রেমিক, কর্মীবৃন্দ ও কর্ণধারগণের করকমলে নূতন চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা স্বরূপ অর্পিত হ'ল।

সন্তান দল

বিষয়-সূচী

প্রশ্ন পৃষ্ঠা

প্রশ্ন পৃষ্ঠা

ভারতীয়

বেদভিত্তিক সাম্যবাদ

প্রশ্ন ঃ—সাম্যবাদ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর ঃ—যেদিন এই বাদ সবার মধ্যে জেগে উঠবে, সেদিনই হবে দেশের শান্তি। এই বাদে যতদিন না আসবে, ততদিনই বাদাবাদি হবে। সাম্যবাদে একদিন সবাইকে আসতে হবে। কারণ সাম্যবাদের ভিত্তির উপর সবাই দাঁড়িয়ে।

প্রশ্ন ঃ—'সাম্যবাদের ভিত্তি' কথাটি যে বললেন, সেটা কি ?

উত্তর ঃ—আকাশস্থিত জগতে সৃষ্ট বস্তু—যার যার individuality maintained হয়ে আসছে natural course-এ, সেই বস্তু individual মনে হলেও সেগুলো সবই বহুবস্তুর সমন্বয়ে। সমন্বয়ের সমভাব প্রতি বস্তুতেই বিদ্যমান। দেখ, গ্রামে থাকলে বাড়ীর কথা বলি—'ঐ বাড়ীটা আমাদের।' অন্য গ্রামে গেলে বলি—'ঐ গ্রামে আমাদের বাড়ী।' জেলায় গেলে পরগণার কথা বলি ;—অন্য জেলায় গেলে বলি—'অমুক জেলায় আমাদের বাড়ী।' অন্য প্রদেশে গেলে প্রদেশ দিয়ে নিজের বাড়ীর পরিচয় দেই। আর বিদেশে গিয়ে ভারতকেই নিজের বাড়ী বলি। দেখ, ক্ষুদ্র বাড়ী কত বড় হয়ে গেল ! অন্য কোন গ্রহে যাবার সুযোগ মিললে তখন বলতে পারা যাবে—'অমুক পৃথিবী আমার বাড়ী।'

সমতা ও প্রসারতার নীতির উপরই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত।

সাম্যবাদ হচ্ছে ব্যাপক। বিশ্লেষণ করে যতই ভিতরে যাবে, ততই দেখবে এর প্রসারতা। সংকীর্ণতার দৃষ্টিতে যারা তাকাবে—সংকীর্ণতার মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে। এই সৌরজগতে সমস্ত অণুপরমাণুগুলোর গতি একটা সমতার সুরে চলছে। সমতা ও প্রসারতার ভিত্তির উপরই এই নীতিবাদ দাঁড়িয়ে আছে। এটা সবার ভেতরই আছে।

দৃষ্টিভঙ্গিমার তারতম্যে শুধুমাত্র বিকৃতি হচ্ছে। তার জন্যই যত অশান্তি।

প্রশ্ন ঃ—তা হলে এক কথায় সাম্যবাদের অর্থ কি বুঝবো?

উত্তর ঃ—এটা হলো দর্পণ-বিশেষ। এই নীতিতে সকলেই প্রতিফলিত হয়—কিন্তু কারও রূপের বিকৃতিতে ওর বিকৃতি ঘটে না।

প্রশ্ন ঃ—আমরা তো সাম্যবাদের ভাবধারা যাদের মধ্যে আছে তাদেরই কমিউনিষ্ট বলে থাকি। আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ—জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সমতার সুরে—সৃষ্টবস্তু তাই সম অধিকারে অধিকৃত। সাম্যবাদ সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। দেব-দেবতাদের সাম্যমূর্তি, সাম্যভাব—এ যে শাস্ত্রেরই কথা। শুধু কমিউনিষ্ট কেন, যারা সত্যিকারের যুক্তি নিয়ে চলে, তারা সবাই এই মতবাদের উপর রয়েছে।

যুক্তিবাদী মাত্রেই নীতিগতভাবে সাম্যবাদী।

প্রশ্ন ঃ- তবে নিজেদের মধ্যে এত বিবাদ হচ্ছে কেন?

উত্তর ঃ—প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সমে বা লয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ থাকবে। প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থার যখনই কোন ব্যতিক্রম ঘটে তখনই প্রলয় হয়। তারপরই শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আজকের যে disturbance—শান্তি ফিরে আসার জন্যই।

প্রশ্ন ঃ—আপনি বলেছেন—আন্দোলন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ ও শান্তি আসবে। বর্তমানে এটা কি করে সম্ভব?

উত্তর ঃ—সাম্যবাদে সমতার সুর। সমভাবে সমতালে কর্মীরা একত্রিত হয়ে কাজ করে, মধুকর যে রকমটি করে। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা অতি সহজেই উপলব্ধি হয়; তার সর্বদিক বিচার করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তার যা কিছু কর্মপদ্ধতি, যা কিছু কর্মপ্রবাহ, সব সমসুরে, সমতালে, একসুরে একত্রিত। প্রকৃতির একটা কণা কিছু নয়, কিন্তু ঐ সহস্র কণা নিয়েই সব।—যেমন মাটির একটি কণা, বৃষ্টির একটি ফোঁটা, শিশিরের এক বিন্দু এমনিতে কিছু নয়, কিন্তু নিয়মের ধারাতে তারা যখন একত্রিত হয়ে নামে, তারা কি না

প্রকৃতিই সাম্যবাদের শিক্ষক।

করছে! এই ভূলোক, জীবলোক—ঐ কণাশক্তি হতেই সব। সেই শক্তি ও বস্তু নিয়েই জীবলোক প্রতিষ্ঠিত। আমাদের চিন্তাধারার ধারা সর্বতোভাবে সেইমুখী হবে। উপরন্তু কিছু উদ্ভব হবে বলে সেই ধারা আরও বেশী, আরও প্রবলবেগে আসতে থাকে। যেমন পর্বতে বৃষ্টিপাত হয়,—গাছ গাছড়াগুলি উদ্ভব হওয়ার মূলেই সেটা।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে এসব কথা বলছেন—সাধু-মহানদের কি রাজনীতি করা উচিত ?

উত্তর ঃ—সর্বাগ্রে। জোনাকি তার নিজের আলোতে খায়—ফণী খায় মণির আলোতে—সূর্যের আলোতে সবাই খায়। ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যক্তির স্বার্থে, সত্যিকারের সাধু মহানদের প্রভাব ব্যাপ্তির স্বার্থে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যে ন্যায় ও নীতি—তাই ধর্ম।

সাধু-মহানদেরই রাজনীতিতে অগ্রণীর ভূমিকা নেওয়া উচিত।

তোমার পিতাকে তোমার পিসতুতো ভাই যদি মামা বলে, তুমি কি তাতে রাগ করবে—"কেন আমার পিতাকে মামা বলবে? আমার পিতা তো 'বাবা'!" এ ঝগড়া ভিত্তিহীন, অমূলক, হাস্যকর এবং অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তোমার পিতা সম্পর্ক অনুযায়ী এক একজনের সঙ্গে এক এক ভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তি কিন্তু একজনই। এখানে বিভিন্ন পথে ও মতে এক একজন এক এক ভাবে এক এক উপাসনায় ধ্যান ধারণায় আছেন। কেউ পূজা-পার্বন নিয়ে আছেন, কেউ যোগসাধনায়, কেউ রাজনীতি বা বাস্তব কর্মের মধ্যে আছেন। তাঁরা যা কিছু করছেন সবই এক সুরেই আছে—শুধু পর্দা বা সম্পর্ক ভিন্ন। যাঁরা ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন—আশ্রমে বাস করছেন বা বনে-পর্বতে চলে গেছেন—তাঁরা পৃথিবী থেকে একেবারে বাইরে চলে যান নি। পৃথিবীতে ঠিকই আছেন—শুধু তাঁরা স্থান অদল বদল করছেন, এ ঘর আর ওঘর করছেন—পোষাক পরিবর্তনের মতন। তাঁদের শাস্ত্র অনুযায়ী এখানেও তো বলা চলে—আধ্যাত্মিকতা কোথায়? গেরুয়া পরলাম, মস্তক মুণ্ডন করলাম, তিলক

কাটলাম, কণ্ঠি গ্রহণ করলাম, বস্ত্র ছেড়ে কৌপিন ধারণ করলাম—শুধু গ্রীনরুম থেকে সেজেই বা'র হলাম। আসলটুকু কোথায়? আগের মত খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, দান-ধ্যান, চিন্তা-ভাবনা, হিসাব-নিকাশ সবকিছুই আছে। তাঁদের বাস্তবের তৃপ্তির দিকটা একভাবে না একভাবে মিটিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন যাঁরা, তাঁরাও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঠিকই সংসার করে গেছেন। এতে তো তাঁদের ধর্ম নষ্ট হচ্ছে না—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বাস্তব-কর্ম, এগুলির কোনটাই ধর্মের অন্তরায় নয়।—রাজনীতিতে গেলেই-বা ধর্ম আটকাবে কেন? আত্মার উন্নতির সাধনা যদি ধর্ম হয়—তবে দেশের উন্নতির, জাতির উন্নতির সাধনা আধ্যাত্মিক পথের অবনতির কারণ হবে কেন?

'আধ্যাত্মিক' কথার প্রকৃত শাস্ত্রগত অর্থ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক; এই তিন নিয়েই প্রকৃত ধর্ম। আধিদৈবিক কথার অর্থ হলো দৈবজাত। যেমন ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি—যেটা বাস্তবে প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এটা বাস্তবেরই সব। আধ্যাত্মিকের আর একটি অঙ্গ হলো—আধিভৌতিক,—সেটা পঞ্চভূত থেকে উৎপন্ন। তার মধ্যে আছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পাঁচটি নিয়েই হলো সমগ্র জীবজগৎ—সেটাও বাস্তবের আর একটা রূপ। আধ্যাত্মিকের তৃতীয় দিক হলো আত্মা সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক। ব্রহ্ম হলো বিরাট—পঞ্চভূতের সবকিছু নিয়েই সে বিরাট। সেখানেও বাস্তব ছাড়া নয়। অতএব আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মিক জগৎ, প্রাকৃতিক জগৎ ও জীব-জগৎ সব কিছুই আসছে। আবার জীব-জগতের মধ্যে আছে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজনীতি আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। এই সচেতনতাটা যদি জীবের মধ্যে সজাগ হয়ে ওঠে, সেটা কি আধ্যাত্মিকতার অঙ্গের ত্রুটি হলো, না তাকেই পূর্ণতর করা হলো? অধ্যাত্মসাধনার কাজই হলো—সকল দিকে সবাইকে সচেতন করে তোলা।

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এইসব কিছু নিয়েই আধ্যাত্মিকতা। তাই কাম, কাঞ্চন, ক্রোধ, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি—কোন

একটিকে বাদ দিলেই আধ্যাত্মিকের অঙ্গহানি হয়ে যাবে।

ধর্মনীতি ও রাজনীতি আলাদা কিছু নয়। অধ্যাত্ম-সাগরের দুইটি ধারা দুইটি নামে অভিহিত। বিরাট ব্রহ্মের বহু শাখা-প্রশাখা,—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে সেই তিন রূপ—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক। দূর থেকেই দই, সন্দেশ, ক্ষীর, রসগোল্লা ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা মনে হয়; চিন্তা করলে দেখা যায়—মূলে সবই দুধ। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড়রিপু থেকে শুরু করে এ-হেন কাজ নাই যা আধ্যাত্মিকের গুণতিতে না পড়ে। এক লক্ষ টাকা বিভিন্ন রকমারি পয়সার সমষ্টিতেই পূর্ণ হয়েছে; একটি নয়া পয়সা বাদ দিলে লক্ষের গুণতিতে ভুল হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক কথার অর্থও হলো সেই রকম। এখানকার কোন বিষয়বস্তুকেই বাদ দেওয়া চলবে না।—কাম, কাঞ্চন, ক্রোধ, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি—কোন একটি নীতিকে বাদ দিলেই আধ্যাত্মিকের অঙ্গহানি হয়ে যাবে। বাইরের মূল্য যার কিছু নেই, তাকেও বাদ দিলে আধ্যাত্মিক-লক্ষের গুণতি ভুল হয়ে যাবে। আর আধ্যাত্মিক জগৎ সবকিছু নিয়েই। তাই আমি দেশের বা দশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা বোধ করি না। এটা যে ধর্মের একটা অঙ্গ, সেটা বিশেষরূপে উপলব্ধি করেছি বলেই আমার লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের এই পথে আনতে আমার অসুবিধা হয়নি। আমার আধ্যাত্মিকতা বেদেরই ধর্ম—আমি তার ভেতরই পেয়েছি সাম্যবাদ। সাম্যনীতিই হোল আধ্যাত্মিক নীতি। সমতার সুর নিয়ে এখানে যে যে-নীতিতেই যাবে, সেটাই হবে আধ্যাত্মিক নীতি—তাতেই তার কাজ হবে।

প্রশ্ন :—ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা তো অন্যরকম।

উত্তর :—ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচারে আমাদের common-sense থেকে যে সেন্স পাই, সেটাই হলো Truth. যেটা প্রকৃতিগত, Truth সেটাকেই খুঁজে বা'র করে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের উপরই সব কিছুর ভিত্তি। শাস্ত্রের আবৃত্তি সেখান থেকেই। সব

সত্যজ্ঞানই ধর্ম—ধর্ম আলাদা বস্তু নয়।

দর্শন বিজ্ঞানও তাই। সুতরাং রাজ-নীতি বা অন্য যে কোন নীতিই এর মধ্যে এসে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—তাই তো মহাপুরুষরা বাস্তবকে এড়িয়ে থাকতে চান। ঠিক নয় কি?

উত্তর ঃ—চমৎকার কথা! বাস্তবেরই তৈরী দেহ, মন, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি ও জ্ঞান থেকেই অনুভূতি—তার থেকেই শাস্ত্র। অস্বীকার যদি করতে হয় আর মিথ্যা যদি বলতে হয়, তবে সবটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে, মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। যেমন এক লক্ষ টাকার একটা পাই পয়সা বাদ দিলে গণনায় ভুল হবে, তেমনি 'ব্রহ্ম সত্যে'র নিকটে যে-কোন বিষয়বস্তুকে বাদ দিলে ভুল হবে। যাঁরা এই চিন্তা করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে ভুলই করে আসছেন। যিনি ভাবছেন, চিন্তা করছেন, যা কিছু বলছেন—এই মিথ্যারূপ দেহ থেকে। মিথ্যার থেকে যে-কথা বলবেন—সবই মিথ্যা হবে। ব্রহ্মের বেলা একটা ভাবলেন, জগতের বেলায় আর একটা ভাবলেন—এটা কখনও হয়? এটা এক জায়গা থেকে দুটি উক্তি মাত্র। যতক্ষণ দেহে রক্ত সঞ্চালিত আছে, কোন মহাপুরুষ বাস্তব এড়াতে পারেন নি, পারবেনও না; এ শুধু বড় বড় বোল আওড়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে একদিন ঠিকই পারবেন, যেদিন খাটিয়াতে উঠবেন।—ওটাই একমাত্র এড়ানো।

কোন মহাপুরুষের পক্ষেই বাস্তবকে এড়ান সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ—যাঁরা বলেছেন—আমরা কাম বর্জন করেছি, কাম বর্জন না করলে ভগবানকে লাভ করা যায় না – তাঁরা কি ঠিক?

উত্তর ঃ—যাঁরা কাম বর্জন করেছেন বলেন, তাঁদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গুলো ঠিকই সচেতন ছিল। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ গান ভালবাসতেন, খেতে ভালবাসতেন, দৃশ্য দেখতে ভালবাসতেন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো ঠিকই ছিল। ওগুলিও দেহের একজাতীয় লিঙ্গবৎ। ভাললাগা আর তৃপ্তি পাওয়া—ওটাই কাম।

কাম শুধু জননে-ন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যেখানে ভাল লাগা—সেখানেই তৃপ্তি—সেখানেই পরিতৃপ্তি

—সেখানেই কাম। ঈশ্বরারাধনাও কাম —কাম কখনও বর্জন করা যায় না।

যেখানে ভাল লাগা—সেখানেই তৃপ্তি, সেখানেই পরিতৃপ্তি,—জননেন্দ্রিয়েই শুধু নয়। যেখানে তৃপ্তি, সেখানেই কাম। কাম সর্বত্র, সর্ব ইন্দ্রিয়, সর্ব বস্তুতে বিদ্যমান—বর্জনের প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন ঃ—শাস্ত্রে তো যোগ তপস্যা ধ্যান ধারণার কথা থাকে—সেখানে কি কোন রাজনীতির কথা আছে ?

উত্তর ঃ—তবে শোন, শাস্ত্রে যেমন যোগ তপস্যা আছে, আবার শত্রু বলির প্রথাও আছে। একদিকে যেমন অহিংসা, আর একদিকে তেমনি দেবতার উদ্দেশে বলি—আমাদের মনের হিংস্র ভাবগুলোকে কর্তন করতে বলেছে। এই হিংস্র ভাবগুলোই আমাদের মনের শত্রু, তাই সকলে একত্রে খড়্গ ধরে শত্রুর প্রতিমূর্তিকে বলি দেওয়া দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। বুঝ ঠিক হলে আমাদের শাস্ত্রের নীতিগুলো এখানকার রাজনীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যেতে বাধ্য। প্রকৃত অর্থের বিকৃতিতেই যত গোলমাল।

যেখানে বলছে—দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করতে হবে, সাধুদের রক্ষা করতে হবে—সেখানে তার প্রতিনিধি স্বরূপ দুটো ছাগকে এনে বলি দিলে তো চলবে না! এখানে কেউ মনের দুষ্কৃতিকে বলি দিয়ে সাধুভাবকে রক্ষা করছে, আবার কেউ দস্যু-দানবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের বিনাশ করার চেষ্টা করছে—যেমন রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে বেরিয়েছিলেন। গান্ধীর রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনতে হলে এমনি ধনুর্বাণ হাতে নিতে হবে, তবেই দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, রাম-রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে হ'লে ধনুর্বাণ হাতে নিতে হবে।

প্রশ্ন :—আপনার 'সন্তান দল' কি সেই ভাবধারাতেই গড়া ?

উত্তর :—'সন্তান দল' সীমাবদ্ধ নয়। **প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্তু মাত্রই সন্তান,** পৃথিবীর **জনগণ** সবাই সন্তান—'সন্তান দল' সেই ভাবধারাতে গড়া।

যে কোন দলের ভালটুকুন্থ গ্রহণ করতে সে রাজী। কোন দলাদলির মধ্যে এমনিতে নেই, আবার সব দল এই 'সন্তান দলের' মধ্যে। এবার ওরা শিবের ত্রিশূল হাতে নিয়েছে, এবার ওদের হাতে ন্যায়ের দণ্ড —তাই কোন অন্যায়কারীকেই ওরা ছাড়বে না। Diagnosis করে হয় ওষুধ দেবে, না হয় operation করবে। ভুললে চলবে না—ছুরি এক হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের operation আর খুনীর খুন এক নয়।

'সন্তান দল' কোন গণ্ডীবদ্ধ দল নয়। সব দলই এই দলের মধ্যে।

প্রশ্ন:—আপনি যে আদি বেদের কথা বলেন সেই বেদের রচয়িতা কে? কি ভাষায় তা লিখিত?

উত্তর:—আদি বেদ নয়, আমি বলি অনাদি বেদের কথা। জগৎ সৃষ্টির মত সেই বেদও সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ থেকে। জীব জগতের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির নিয়মে, প্রয়োজনমত সব কিছু এই মহাকাশ থেকেই আসছে। বেদের সৃষ্টিও সেইভাবেই। মহাকাশ হচ্ছে জ্ঞানের আধার। বেদই হচ্ছে জ্ঞান। সুতরাং বেদ মহাকাশেই আছে। আবার মহাকাশই বেদ। ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা গবেষণার দ্বারা সেই মহাকাশের মহাজ্ঞানের পাঠ কিছুটা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তাঁদের বলা হতো বেদজ্ঞ অর্থাৎ বেদকে যাঁরা জ্ঞাত হয়েছিলেন।

মহাকাশের মহাজ্ঞানই হচ্ছে বেদ —বেদ কোনও রচিত গ্রন্থ নয়।

জীবজগতে কত বিচিত্র, কত সহস্র সহস্র বিষয়বস্তু আছে। প্রত্যেকের জীবনধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও সাথে সাথে আছে। এই ব্যবস্থাগুলোর দিকে তাকিয়ে যদি চিন্তা করা যায়, তবে স্পষ্ট মনে হয়, কে যেন বুঝে বুঝে প্রয়োজনমত ও সময়মত সব কিছু পাঠাচ্ছে। কে পাঠাচ্ছে, কিভাবে আসছে, কোথা থেকে আসছে, সে সব কথা এখন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ওগুলো রহস্যের মধ্যেই থাক। তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি যখন আছে, সেই সীমার মধ্যে

যতটুকু আসে তারই পথ ধরে ধরে চিন্তা করে যাও। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যাও। দেখ মূলে কি আছে। তবেই বুঝতে পারবে—অনন্ত বিশ্বের মূল কি, বেদ কি, কে তার স্রষ্টা। প্রথমেই একটা না বুঝে ধরে নেওয়ার দরকার কি!

এই যে এত বড় আকাশ, শুধুচোখে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সম্পূর্ণই ফাঁকা; তার মধ্যে তো কত গ্রহ, উপগ্রহ, অণু-পরমাণু, তার চেয়েও কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তু শৃঙ্খলার সঙ্গে আপন আপন গতিপথ পরিক্রমণ করে চলেছে। বহু অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে কত কিছুর automatic production (আপনাআপনি সৃষ্টি) হয়ে যাচ্ছে। মেসিনের মত এই ফাঁকার ফ্যাক্টরীতে কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই যে ফাঁকা থেকে সৃষ্ট বস্তুগুলি, একে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চেতন, অচেতন যে নামেই অভিহিত করনা কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সেটা তো একটা ব্যবহারিক ভাষা মাত্র। আমাদের চিন্তা করতে হবে, আকাশ থেকে সৃষ্ট বস্তুগুলোর স্বরূপটা কি? এই সৃষ্ট বস্তুগুলো ফাঁকারই একটা রূপ বিশেষ। কারণ বস্তুর যে কোন দিক বিশ্লেষণ করতে গেলে ফাঁকা ছাড়া কিছুই মেলে না। যে যে গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি বস্তু, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেগুলো অনুভব করছি, খুঁজতে গেলে তার একটা গুণও আমরা খুঁজে পাই না। এই যে কি সুন্দর ফুল, চোখের সামনে তার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি, ঘ্রাণ দিয়ে তার গন্ধ পাচ্ছি, হাতে স্পর্শ করে তার কোমলতা অনুভব করছি। কিন্তু খুঁজতে গেলে কোনটাই পাওয়া যায় না। সবটাই ফাঁকা।

জীবকে বিশ্লেষণ করতে গেলে রক্ত, মাংস, অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আবার তাকেও যদি বিশ্লেষণ কর, তবে আরও সূক্ষ্মে চলে যেতে হয়। রক্ত কোথা থেকে এলো?—খাদ্য থেকে। খাদ্য কোথা থেকে এলো?—উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ এসেছে মাটি, জল, আলো, হাওয়া থেকে। আবার এই মাটি, জল, হাওয়া সকলেরই উদ্ভব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে, যা আকাশেই বিদ্যমান। সুতরাং দেখছ, জীবের শিরায় শিরায় যে রক্তের ধারা, তা কোন অদৃশ্য পথ ধরে আকাশ

থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এইভাবে অস্থি, মজ্জা, ত্বক, সব কিছুকে ধরে ধরে বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে যাও। দেখবে সব কিছুই ফাঁকায় বা আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাতেই বোঝা যায়—ফাঁকা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, ফাঁকাতেই সব কিছু আশ্রয় নিয়ে আছে, আবার ফাঁকাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সব কিছু আকাশে। আকাশকে আশ্রয় করে, আকাশের গতির সাথে গতি মিলিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই আকাশের প্রতি অণুতে পরমাণুতে আকাশেরই বর্ণনা। বাস্তবের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আকাশেরই প্রকৃতি নিহিত। তাদেরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় আকাশের বৈশিষ্ট্য। আকাশ ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু বস্তুকে ধরতে পারি। তার মধ্য দিয়েই আকাশকে ধরা, বোঝা যায়। তাকে চেনার মত যা কিছু, বস্তুকে কেন্দ্র করেই পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই আকাশের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। এই যে বর্ণনা, তাহাই বেদ। এই বেদের প্রতিটি ছন্দ, প্রতিটি ছত্র যদি ভালভাবে পাঠ করা যায়, তবে বুঝতে পারবে, জীবের প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন সব কিছু আপনা থেকে আসছে, তেমনি কিভাবে চলা দরকার, কিভাবে চললে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যাবে, এবং কিভাবে বিশ্বরহস্যকে অবগত হওয়া যায়, তারও আদেশ, নির্দেশ ও ইঙ্গিত নানাভাবে, নানা দিক থেকে দিয়ে যাচ্ছে।

এই যে জীবজগতের বহু জীব, নিরীক্ষণ করলে দেখবে তাদের ভেতর বহু ভাব, বহু স্বভাব, বহু রকম আচার ব্যবহার। এগুলিই প্রকৃতির নির্দেশ আকারে প্রত্যেকের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এগুলো বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেকের এক একটি নিজস্ব চাল-চলন আছে। তাদের প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, আদান-প্রদান, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ঠিকমত পাঠ করা যায়, এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলিকেই যদি আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োগ করা যায়, তবেই দেখবে জীবন কত

জীবনকে উন্নত করতে হলে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করতে হবে—প্রতিটি জীবের

বিভিন্ন আচার-ব্যবহার থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সহজ ও সুন্দর জীবনই উন্নত জীবন। সুতরাং জীবনকে উন্নত করতে হলে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ কর। ওটাই বড় গ্রন্থ। ওটাই প্রকৃত শিক্ষা। এই যে বিরাট প্রকৃতির গ্রন্থ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে, তাহাই বেদ। সেই বেদ পাঠ কর—দেখবে, তোমার জীবনের পথ-পাথেয় সব পেয়ে যাবে।

সহস্র সহস্র বছর আগে সেই সব চিন্তাশীল ব্যক্তি—যাঁদের মুনি, ঋষি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ ও তার রহস্য উদ্ধারের গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাকেই বলা হতো সাধনা। হয়তো একশ' বছর সাধনা করে তাঁরা সেই বিরাট গ্রন্থের অগণিত পৃষ্ঠার যেটুকু পাঠ উদ্ধার করতে পারলেন, সেটুকু মুখে মুখে তাঁদের উত্তরপুরুষকে কয়েক বছরে শিখিয়ে দিলেন এবং বলে গেলেন, "এ গ্রন্থ বিরাট—এ রহস্য অনন্ত, আমরা তার কতটুকুইবা তোমাদের দিতে পেরেছি! তোমরা নিজেরা আরও অনুশীলন করে যাও। তার পাঠ উদ্ধার করার জন্য আরও সাধনা কর।" এঁরা তখন যা পেলেন, তার পর থেকে আবার প্রকৃতির গ্রন্থের নতুন অধ্যায়ের পাঠে মগ্ন হলেন। তাঁদের একশ' বছর জীবৎকালের মধ্যে সাধনা ও গবেষণার দ্বারা তাঁরা আরও কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করলেন। একশ' বছরের সাধনায় তাঁরা কিন্তু দু'শ' বছরের সাধনার ফল পেয়ে গেলেন। এই দু'শ' বছরের মিলিত সাধনার ফল তাঁরা আবার তাঁদের উত্তরপুরুষকে মুখে মুখে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমরা আবার নিজেরা গবেষণায় রত হও।" এরা আবার একশ' বছর সাধনা করে আরও নতুন তথ্য উদ্ধার করল। এবার তারা একশ' বছরে তিনশ' বছরের সাধনার ফল পেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, পুরুষ পরম্পরায় প্রকৃতির গ্রন্থ অর্থাৎ বেদের কিছু কিছু অংশ মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। তারপর আরও বহুশতাব্দীর পর যখন লিপির উদ্ভব হলো, তখন সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব একে লিখিত রূপ দিলেন।

প্রকৃতি হলো সত্য। সেই সত্যবতীর পুত্র সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য করলেন বেদের বিভাগ।—নাম ছিল তাঁর ব্যাসদেব। 'ব্যাস' কথার অর্থ হলো ভাগ—ব্যাসদেব কোন বিশেষ মুনি নন। প্রকৃতিদত্ত সত্যের নানা রূপকে নানাভাবে বুঝবার জন্য, প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থাকে সহজে বোধে আনার জন্য এবং জীবজগতের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন মুনিঋষিদের চিন্তাধারাকে এক একটি বিভাগে প্রকাশ করা হয়েছে; তাই এর সংগ্রাহককে বলা হয়েছে ব্যাসদেব।

এই যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুনি, ঋষি, ব্যাসদেব ইত্যাদি বলা হয়, এঁরা কেউই বেদের রচয়িতা নন, প্রকাশকও নন। এঁরা বেদের বাণীর প্রচারক মাত্র। বেদ আপনা থেকেই রচিত, আপনা থেকেই স্ফুরিত, আপনিই প্রকাশিত, আপনাতেই আপনি বিকশিত। এখনও সেই অনাদি, অনন্ত বেদের অগণিত পৃষ্ঠা অপঠিতই আছে। বহু যুগের বহু মনীষীর সাধনা ও গবেষণার ফলে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা' মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু বারি মাত্র। আজ তাও আবার বিশুদ্ধ নেই। চক্রান্তকারীদের চক্রান্তে সেই তৃষ্ণার বারি দূষিত হয়ে গেছে। সেটাই বড় দুঃখের।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে বেদের সাম্যবাদ দেশে আনতে চান—সেটা কি? এবং তার সঙ্গে এখানকার Communism-এর পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ—বেদের সাম্যবাদটি কি, সেটা জানার আগে বেদটি কি সেটা আরও বিশদভাবে জেনে নেওয়া দরকার। বেদ একটি শাস্ত্র—যার মূল কথা হলো জ্ঞান। পূর্বেই বলেছি, তার আদি রচয়িতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদ হলো সম্পূর্ণ প্রকৃতিদত্ত। বেদ অর্থাৎ জ্ঞানই হলো সমাজের ভিত্তি—তার প্রথম কথাই হলো সংস্কার-বিমুক্তি। প্রকৃতি থেকে যে বেদের সৃষ্টি, তা বিরাট ও জটিল। এই বিরাট প্রকৃতি যাতে সহজে বোধগম্য হয়, তার জন্যেই তাকে নানাভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলিই ভারতের এক একটি প্রাচীনতম বিখ্যাত সাহিত্য ও শাস্ত্র নামে অভিহিত।

বেদ অর্থ জ্ঞান, বেদ প্রকৃতিদত্ত সত্যরূপ—কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা রচিত নয়।

বেদের দুইটি ধারা। একটি আস্তিক্যবাদ, আর একটি নাস্তিক্যবাদ। এক একজন এক একটি ধারার চর্চা করেই শ্রেষ্ঠ স্থান পেলেন। যেমন ধর চার্বাক মুনি—তিনি বস্তুবাদের প্রতিনিধি রূপে খ্যাত। তিনি তাঁর যুক্তি-চিন্তা বেদ থেকে নিয়েই দিলেন। আবার যাঁরা আস্তিক্যবাদী, তাঁরাও তাঁদের সমস্যার সমাধান দেখালেন বেদ থেকেই। আমি বলব, বেদের এই উভয় ধারাই পরস্পর নির্ভরশীল। 'আছে' বা 'নাই'—সকল সমস্যার সমাধানই বেদে পাওয়া যায়। বেদ হচ্ছে জ্ঞান, তাই বেদই সমাধান। এখানে সকলকে এক হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এক করার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ থাকবে না। ধনী দরিদ্র বলে কোন শ্রেণী থাকবে না। থাকবে সকলে এক মাটির আসনে। সকলেই মাটির সন্তান। সুতরাং সেখানে সকলের সম অধিকার।

আস্তিক্যবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ—বেদের এই দুইটি ধারা পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রকৃতির সমবণ্টন, রক্ষণ-পালনের যে নীতি, তারই সুর নিয়ে হলো বেদ। সুতরাং বেদের শিক্ষাই হলো সম অধিকার। শুধু মানুষ নিয়ে কথা নয়, জীবজগতের সমস্ত জীবসমষ্টি নিয়েই এই কথা। একটি ক্ষুদ্রতম প্রাণীও সমঅধিকার থেকে এতটুকুন বঞ্চিত হতে পারবে না। এটাই হলো বেদের সাম্যবাদ। এই বেদের শিক্ষাতেই যারা শিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তারা সেইভাবেই সমাজকে পরিচালিত করুক—এটাই আমি চাই।

বেদের সাম্যবাদে একটি ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও সম-অধিকার স্বীকৃত।

আজকের দিনেও তো শুনছি সেই কথাই বলা হ'চ্ছে। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সাম্যবাদ আনার চেষ্টা চলেছে, বেদের আমলে সেটাই বলবৎ ছিল। সকলেই চাষ করত, জমির উপর সকলেরই মালিকানা ছিল। আলাদাভাবে মালিকের কাছে হাত পাতা বা আন্দোলন করার কোন প্রশ্নই আসত না। যদি কেউ এদিক ওদিক মালিকানার ভাব নিয়ে মাথা উঁচু করার চেষ্টা করত, তখন তার

মাথা মুড়িয়ে তার সঞ্চিত সম্পত্তি সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হতো। তবে সমবণ্টন করার অর্থ পরিমাণে সমান ভাগ নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ। যার যতটুকু প্রয়োজন, তাকে ততটুকুই দেওয়া হতো; সেও ততটুকু নিয়েই খুশী হতো, তার বেশী চাইত না—চাওয়ার ইচ্ছাও হতো না। সবকিছু শৃঙ্খলা সহকারে ভাগ করা হতো। এই শৃঙ্খলার মধ্যে বা সামঞ্জস্যের মধ্যে যদি কখন কেউ বিঘ্ন ঘটাত, তবে তাকে ক্ষতিকারক জীবাণুর মত সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ বেদেতেই আছে এবং তা করাও হতো। সকল যুগে, সকল কালে, সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক থাকে, যাদের মধ্যে সঞ্চয়বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে। বেদের আমলেও যে এমন লোক একেবারেই ছিল না, তা নয়। যাদের মধ্যে সঞ্চয়বুদ্ধি ছিল, বেদ তাদেরই ক্ষতিকারক শ্রেণীভুক্ত করেছে; বেদে তাদের 'শোষক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথাও বলা হয়েছে। তবে লড়াইএর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতিকারক জীবাণুকে উচ্ছেদ করে দিয়ে সমাজে শৃঙ্খলা আনা। তাদের 'ঘেরাও' করে তাদের কাছে হাত পাতা নয়, কিম্বা আন্দোলনের নামে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়।

বেদে সমবণ্টন অর্থ পরিমাণে সমান ভাগ নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাগ।

কৃষিবিপ্লব আমাদের দেশে বেদের যুগ থেকেই চলে আসছে। বৈদিক যুগে কৃষিকর্ম পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হতো। ধনী-দরিদ্র রাজা-প্রজা সকলকে তখন লাঙ্গল ধরতেই হতো, চাষ করতেই হতো। তা ছাড়া বেদে বলছে—**'একটি ব্যক্তিও অনাহারে দিন যাপন করতে পারবে না,' 'ভিক্ষাবৃত্তি থাকতে পারবে না', 'সঞ্চয় বুদ্ধি রাখবে না', 'অব্যবহৃত ধন কাজে লাগাবে', 'ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে', 'অভাব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে'**।—এগুলি সব বেদের কথা। আবার এ সবই তো আজকের দিনের বিপ্লবের কথা। সুতরাং সেই বেদের যুগে কৃষিও পেলাম—বিপ্লবও পেলাম। এখন তোমার কথা হ'চ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব। এই অস্ত্রের কথাও আমাদের শাস্ত্রে আছে। দেবাদিদেব মহাদেব—তাঁর হাতে

ত্রিশূল ; দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—তাঁর হাতে খড়্গ ; সৃষ্টি-রক্ষাকারী বিষ্ণু—তাঁর হাতে গদা ; কৃষ্ণের হাতে চক্র ; এত বড় অবতার রাম—তাঁর হাতেও ধনুর্বাণ। এসব অস্ত্রই হচ্ছে দুষ্টের দমনের জন্য। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রে তোমরা কৃষিও পেলে, বিপ্লবও পেলে, অস্ত্রও পেলে। অতএব এইভাবে আমাদের দেশে বিপ্লব আনাটা নূতন কথা নয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—সত্যিকারের বিপ্লব শুধু কৃষকদের জাগালেই হবে না ; দেশের অগণিত শ্রমিক, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও খাদ্যাভাবে জীবনপাত করছে তাদেরও ডাক দিতে হবে। আমাদের দেশ আজ ভিক্ষুকের দেশ। কোটি কোটি ভিক্ষুকে আজ দেশ ভরে গেছে। তারা দিনের পর দিন না খেয়ে মরছে, অথচ হামলা করতে শেখেনি, সামনে মিষ্টির দোকান দেখেও তারা কেড়ে খেতে শেখেনি ; ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপ করেই থাকে। আবার ফুটপাতে অনাহারে মানুষকে মরতে দেখেও একশ্রেণীর লোকেরা রেষ্টুরেন্টে বসে খেয়ে যেতে দ্বিধা করে না। বিপ্লব যদি আনতে হয় তবে এদিক থেকেও আনতে হবে। কারণ কৃষকদের তুলনায় আমাদের দেশে ভিক্ষুকও কিছু কম নয়। এবং ক্রমশঃই যেন এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

ভারতে সাম্যবাদের বিপ্লব আনতে হ'লে শুধু শ্রমিক-কৃষকদের জাগালেই হবে না; কোটি কোটি ভিক্ষুকদেরও জাগাতে হবে।

বৃটিশ-আমল থেকে কংগ্রেস-আমল পর্যন্ত সকলেই দেশকে ভিখারী করে তুলেছে ; আর এই ভিখারী গড়ে' তুলতে সাহায্য করছেন অনেক নামধারী ধর্মগুরুরা। 'সংসার মায়াময়, মিথ্যা—একমাত্র ঈশ্বরই সব'—ধর্মগুরুদের এই সব তথাকথিত আধ্যাত্মিক নীতি মানুষকে উদাসীনতার পথে ঠেলে দিয়ে অলস, অকর্মণ্য করে তুলেছে। তারা তাদের সবকিছু আশ্রমে দান করে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে পড়ছে। এটাকে আমি ধর্ম হিসাবে ধরি না, ধরবও না। শাস্ত্রের অর্থকে বিকৃত করে মানুষকে অভাবের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে কর্ম থেকে বিচ্যুত করাকে আমি ধর্ম বলি না। যার যা কর্ম, সেটা ঠিকমত করাই প্রকৃত ধর্ম। আমাদের ধর্মনীতিতে কেউ কখনও

না খেয়ে থাকতে পারবে না, কোন অভাব অভিযোগের সম্মুখীন হতে হবে না ; সর্বদিকে ভরপুর থাকাটাই ধর্মনীতির একটা বিশেষ অঙ্গ। কর্মই ধর্ম। তার জন্য বৈরাগীর বেশ ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। অথচ ধর্মের নামে কতকগুলি vague, কল্পনাপ্রসূত কথা বলে আজ সমস্ত দেশটাকে ভিখারী করে তোলা হয়েছে। এই ভিক্ষুক মনোবৃত্তির জন্যই আজ অল্পকিছুর লোভ দেখিয়ে দেশবাসীকে দিয়ে অনেক মারাত্মক কাজ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। দেশকে বাঁচাতে হলে এই ভিক্ষাবৃত্তি চিরতরে দূর করতে হবে। এই মনোবৃত্তি দূর করতে হলে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষেতে চাষ করতে পাঠাতে হবে, খেটে খেতে হবে।

আজ মঠ, আশ্রম প্রভৃতি ধর্মকেন্দ্রগুলিতে যে ধর্মনেতারা আছেন তাঁরা যেন সমাজে ভিক্ষুক বাড়াবারই চেষ্টা করছেন। বেদ-চর্চা তাঁরা করছেন বলে বলেন, অথচ বেদের বিরোধিতাই তাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। বেদে কোথাও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলা হয়নি। অথচ এঁরা এক কথাই বলেন—ভগবানের নামে ভিক্ষা করব। তার ফলে কয়েক কোটি ভিক্ষুক দেশে বেড়ে গেছে! সুতরাং এদেরও চেতনা আনা দরকার ; অর্থাৎ বিপ্লব আনতে গেলে কৃষক, শ্রমিক, ভিক্ষুক—সবার মধ্য দিয়েই আনতে হবে। তখনই প্রকৃত জনবিপ্লব আসবে। আর এই জনবিপ্লবে অবস্থা বুঝে অস্ত্র ধরতে হবে, আবার প্রয়োজনমত প্রেমের পথ নিতে হবে। শাস্ত্রে সে নির্দেশও আছে। এই চিন্তাধারাই আমাদের দেবদেবীর মূর্তিতে রূপ পেয়েছে। তাদের এক হাতে অস্ত্র, আর এক হাতে বরাভয়। অর্থাৎ লাঠির জায়গায় লাঠি—বুঝের জায়গায় বুঝ।—তবেই সমতা আসবে।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—সুতরাং বেদভিত্তিক সাম্যবাদের

আজ আমাদের দেশে সত্যিকারের গণবিপ্লব আনতে হ'লে একটি সুন্দর নিরপেক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন। সে সংগঠন মাও-সে-তুংএরই হোক, লেনিনেরই হোক আর যারই হোক—তাতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু

সঙ্গে হাত না মেলালে মার্কস্‌বাদ, লেনিনবাদ বা মাওবাদ এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না।

তাদের ভারতীয় সাম্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিতে হবে। মার্কস্ বা লেনিন বা মাও-সে-তুং এর মত-বাদের উপর ভিত্তি করে যদি এখানে বিপ্লব আনার চেষ্টা কর, তা হ'লে সম্পূর্ণ সফল হওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটবে। কারণ আমাদের জাতীয় প্রকৃতি হচ্ছে—আমরা ধর্মে বিশ্বাসী।

এক দেশের গাছ তুলে এনে আর এক দেশের মাটিতে পুতে দিলেই তো আর সহজে ফল ফলে না! ওখানকার মাটির সঙ্গে এদেশের মাটি মেশাতে হবে, ওই পরিবেশের সঙ্গে এই পরিবেশ এক করলে তবেই গাছটি বাঁচবে—তাতেই ফল ফলবে। 'সশস্ত্র বিপ্লব', 'কৃষি-বিপ্লব' বলে চিৎকার পাড়লেই আর আমাদের দেশে বিপ্লব আসবে না। আগে বাংলা তথা ভারতের প্রকৃতিটি বুঝতে হবে, তার নাড়িটি ধরে সেন্টিমেন্টের স্পন্দনটি অনুভব করতে হবে, তারপর সেই স্পন্দনের ছন্দে ছন্দে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারলেই ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করবে। তা না হ'লে হিতে বিপরীত হবে। ঐ দেশে চৈত্র মাসে দুটো কম্বল গায়ে দেয়—তাতেই তাদের আরাম। তাই দেখে আমাদের দেশে চৈত্র মাসে কম্বল গায়ে দিলে (গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবে) আরামের বদলে ব্যারামই হবে।

আমাদের দেশ ভাগ্যে বিশ্বাসী, আমাদের দেশ ভগবানে বিশ্বাসী, আমাদের দেশ ধর্ম বলতে অজ্ঞান। সেখানে হঠাৎ এসে 'এসব আফিং-এর নেশা' বলে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না! এখানে বিপ্লব আনতে হলে প্রতি পদে পদে চিন্তা করতে হবে। তাদেরই কথা দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, তবেই তারা বুঝবে। হঠাৎ এদের মার্কস্‌বাদ বা মাও-বাদ বোঝাতে শুরু করলে হালের কিছুসংখ্যক ছেলেরা তা গ্রহণ করবে, কিন্তু শতকরা ৯৫ ভাগই গ্রহণ করবে না। তাদের দিতে হবে তার সঙ্গে বেদবাণী।

দেশের কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন—সাম্যবাদকে প্রতিটি দেশবাসীর মনে গেঁথে দেওয়া। এই সাম্যবাদ কোন

বিদেশী ভাবধারা নয়। শুধু একে পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। চীন মাও-বাদের জন্য, রাশিয়া লেনিন-বাদের জন্য যেমন গৌরব অনুভব করে, আমরাও সেই রকম আমাদের বেদের সাম্যবাদের জন্য গৌরবান্বিত।

এখানকার কমিউনিষ্ট যাঁরা, তাঁরাও সাম্যবাদী। তাঁরা যে চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্রমতে চলেছেন, আর বেদের যে সাম্যবাদ, খুঁজে দেখলে দেখা যাবে তাদের একই কথা, শুধু নামের হেরফের। সাগরের জল সবখানেই এক। শুধু দেশের নাম অনুযায়ী তার নামকরণ হয়—জলের প্রকৃত কোন ভাগ হয় না। 'ভারত সাগর' আর 'আটলান্টিক সাগর'—শুধু নামে পার্থক্য, বস্তুতঃ দুই-ই এক। এখানেও তেমনি Marxist-সাম্যবাদ আর বৈদিক সাম্যবাদ—নামটি দুই, কথাটি এক। Marxist-এর রক্ত আর বৈদিকের রক্ত একই রকম লাল। সম অধিকারের নীতিতে যারা দাঁড়িয়ে আছে—নামের দিক থেকে তাদের পার্থক্য যাই থাক, নীতির দিক থেকে তারা এক। সেই রকম আবার স্থানভেদে রাশিয়ার কমিউনিজ্‌ম্‌, চীনের কমিউনিজ্‌ম্‌ ও ভারতীয় কমিউনিজ্‌ম্‌—এই নাম ভেদে কিছুই আসে যায় না। তাই আমার ধারণা, এই তিন সাম্যবাদের দেশ একদিন নিজেদের সংস্কার, ভুল বোঝাবুঝি ও বাইরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে এক হবে।

বৈদিক সাম্যবাদ ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদ—শুধু নামেরই পার্থক্য—নীতির দিক থেকে এক।

ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর—এই বিভিন্ন সাগরের মধ্য দিয়েই সব সাগরে যাওয়া যায়। সাম্যবাদ হলো সেইরকম একটি মহাসাগর। এক এক স্থানে এক এক রকম নাম। আর তারই তীরে আছে ভারত, চীন, রাশিয়া—তারা প্রতিবেশী; যোগাযোগ হচ্ছে এক সাম্যবাদের মহাসাগরে। আবার স্থলপথেও হচ্ছে, আকাশপথেও হচ্ছে। সাম্যের নীতি সবখানেই আছে। যার বুকে বাস করছি তার

ভারত, চীন, রাশিয়া, এই তিন সাম্যবাদের দেশ এক সাথে হাত মেলাবে এবং কালে পৃথিবীময় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মধ্যে কোন জাতিভেদ, নীতিভেদ নেই ; সবাইকে সমানভাবে স্থান দিয়েছে। সবটাই সাম্যভিত্তির উপরে। সূর্যের সহজ আলোর গতিপথ একখণ্ড মেঘে সাময়িকভাবে রুদ্ধ হতে পারে সত্য—আবার তারই তেজে সেই মেঘ সরে যায়। আলোর পথও তখন সহজ হয়ে যায়। আমাদের সাম্যনীতির তেজ ও প্রভাবকে, তার সহজ গতিপথকে সংস্কাররূপ মেঘখণ্ড সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আমাদের জ্ঞানরূপ সূর্যের তেজেই একদিন সেই সংস্কার দূরীভূত হয়ে পৃথিবীময় সাম্যবাদের নীতি ছড়িয়ে পড়বে। তখন আর কোন বিবাদ-বিচ্ছেদ থাকবে না। তখন সেই বেদই হয়ে উঠবে সকলের বেদী।

প্রশ্ন :—এখানকার সাম্যবাদে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নেই। বৈদিক সাম্যবাদে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে কি ?

উত্তর :—বৈদিক সাম্যবাদে সবার সমান অধিকার থাকবে, ব্যক্তিগত ও একচ্ছত্র আধিপত্য চলতে পারবে না। এখানে ব্যক্তির পূজা চলবে না, পূজা হবে ব্যাপ্তির। এই সাম্যবাদ পার্টির গণ্ডিতেও সীমাবদ্ধ নয়। জন্মগত অধিকার নিয়েই এই সাম্যবাদ। প্রকৃতি স্বয়ং সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমাদের জীবনের চলার পথেও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে যার যা করণীয়, সবটাই সমান তালে মাত্রায় সমভাবে ঠিকমত মেনে চলাই সাম্যবাদের পথ অনুসরণ করা।

বৈদিক সাম্যবাদে ব্যক্তিপূজা থাকবে না, পার্টির প্রাধান্যও থাকবে না। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য থাকবে সমষ্টির মাত্রায়।

প্রশ্ন :—বৈদিক যুগেও তো ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। সাম্যবাদের নীতিতেই যখন সমাজ গঠিত ছিল, তখন এদের মধ্যে ধনের সমবণ্টন কিভাবে হতো ? অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই বা তারা কিভাবে করত ?

উত্তর :—কৃষিকার্যই ছিল তখন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রধান উপায়। দরিদ্রই হোক আর ধনশালীই হোক, লাঙ্গল হাতে ক্ষেতে সকলকে যেতে হ'তো। চাষ করাটাই তখন সম্মানের ছিল। শিক্ষায়-দীক্ষায়,

বিত্তে-পাণ্ডিত্যে যাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁরাও লাঙ্গল হাতে ক্ষেতে চাষ করতে গৌরব বোধ করতেন। নিজেরা তো যেতেনই, পরিবারের সকলকেই চাষ করতে উৎসাহিত করতেন। আজকাল যেমন চাষী বলতে বিশেষ একশ্রেণীর লোকদের বোঝায়, সেই সাম্যবাদের যুগে কর্ম অনুযায়ী সে রকম শ্রেণীবিভাগ করা হ'তো না। ব্রাহ্মণ-সন্তানকেও লাঙ্গল ধরতে হ'তো, রাজপুত্রকেও লাঙ্গল ধরতে হ'তো। সেই জন্যই বলরাম ছিলেন হলধর। শ্রীকৃষ্ণ রাখালবেশে গোচারণ করতেন, বাঁশী বাজাতেন। যে হল ধরতে না চাইত, তাকে সমাজ থেকে একঘরে করে রাখা হ'তো। এই কৃষিকার্যই ছিল তখন অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়। জমিতে ফসল ফলিয়েই তারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে ফেলত। প্রকৃতিদত্ত জমির এতটুকু অংশ নষ্ট করাকে তারা পাপ মনে করত। যে অপর্যাপ্ত ফসল ওরা ফলাত, তা সকলের মধ্যে সমবণ্টন করা হ'তো। শুধু মানুষের মধ্যে নয়, পশুপাখীরাও এই সমবণ্টন থেকে বাদ যেত না। গো-মহিষাদির জন্য আলাদা জমি সংরক্ষিত থাকত। সেখানে তাদের জন্যই তৃণের চাষ হ'তো। আজও শ্রাদ্ধাদিতে বৃষসহ গাভী দান করলে তার সঙ্গে ভূমি দানের রীতি আছে। তার অর্থই হলো, যে গাভী দান করা হলো, তার রক্ষার্থে, পালনার্থে এই ভূমিও দান করা হ'লো।—সেসব ভূমি কেবলমাত্র গোচারণ ভূমি হিসাবেই সংরক্ষিত থাকত।

বৈদিক যুগে মূলতঃ কৃষির দ্বারাই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা হ'ত—এতটুকু জমি পতিত রাখা হ'ত না।

এখনকার মত ভিক্ষাবৃত্তি তখন ছিল না। খাদ্যের চাহিদা, অর্থের চাহিদা কারুর ছিল না; তবে ভিক্ষুক কথাটা ছিল। ভিক্ষুক বলতে তারা বুঝত—যারা জ্ঞান ভিক্ষা করে। তাই ভিক্ষুককে তারা শীর্ষস্থান দিত।

অর্থসংকটে যাতে কাউকে পড়তে না হয়, তার উপায় বহুদিক থেকেই করা হয়েছিল। নানারকম শিল্পের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল।

শিল্পীরা নানারকম ধাতু দিয়ে অলঙ্কার তৈরী করত, লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরী করত, তুলা, লোম কিংবা গাছের বাকল দিয়ে বস্ত্র তৈরী করত, মাটির বাড়ীর সাথে সাথে পাথর দিয়ে অনেকে বড় বড় প্রাসাদও তৈরী করত। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ উপার্জন করত এবং প্রয়োজন মিটাতো। সেই বেদের সাম্যবাদের যুগে অর্থ ও ধনের সমবণ্টনের ফলে কারুর কোন অভাবও ছিল না, উদ্বৃত্তও ছিল না।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে বলছেন, সেই বেদের যুগে সকলেই তাদের অর্থ, খাদ্য সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিত—ভবিষ্যতের জন্য তারা কি তবে কিছুই সঞ্চয় করত না ?

উত্তর ঃ—রাজা, ধনশালী, বিত্তশালী যে একেবারেই সঞ্চয় করত না, সে কথা বলি না। কিন্তু তাদের সঞ্চয় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়—বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তায় তারা সঞ্চয় করত না। সমাজের কল্যাণকর কাজে লাগাবার জন্যই তারা ভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় করত। সে ধনভাণ্ডার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সব সময়ই উন্মুক্ত থাকত।

বেদের যুগেও সঞ্চয় ছিল—কিন্তু তা ছিল সমষ্টির জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়।

অভাবও যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। কিন্তু যখনই যারা অভাবের মধ্যে পড়েছে—তখনই তারা কোন রকম দ্বিধা না করে রাজদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ; রাজাও দ্বিধা না করে মুক্তহস্তে তাদের দান করেছে। এইভাবেই সঞ্চিত ধন সমবণ্টিত হয়েছে।

এখনকার মত পুঁজিবাদীদের তখনও সকলে ঘৃণা করত। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ছিল, যারা শুধু আপন আপন স্বার্থেই ধন সঞ্চয় করে রাখত। আরা ছিল স্বার্থান্বেষী—তাই তাদের ধনকে বলা হয়েছে 'বিফল ধন' অর্থাৎ যে ধন পরের উপকারে লাগে না। তারা সঞ্চিত ধনকে কখনই সমাজকল্যাণে ব্যয় করত না বলে তাদের ধনকে যেমন বিফল বলা হয়েছে, তেমনি তাদেরও সমাজের কাছে ঘৃণ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন যেমন পুঁজিবাদীদের উদ্‌বৃত্ত সঞ্চিত ধন কেড়ে নিয়ে অর্থ নৈতিক সমতার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তখনও সেরকম মনোভাব ছিল। বেদ বলেছে—'বিফল ধন হ্রাস কর'—অর্থাৎ যে ধন ব্যবহৃত হচ্ছে না, তাকে নষ্ট করে দাও। বিফল ধনের অধিকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সঞ্চিতধন কেড়ে নিয়ে, তাকে জনগণের প্রয়োজনে ব্যয় কর। তাঁরা মনে করতেন, ধনকে সফল করতে হলে, শুধু সঞ্চয় করে রাখলে চলবে না, তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কৃপণ, স্বার্থপর, অনুদারদের কাছ থেকে ধন কেড়ে নিতে তাঁরা সংগ্রামের কথাও বলেছেন। সুদখোরিনীতি, শোষণনীতি ও ধনলোলুপতা তখন বিশেষভাবে নিন্দনীয় ছিল। সংগ্রামের মাধ্যমে এদের বিনাশের কথা বেদের অনেক জায়গায়ই বলা হয়েছে। আজকের দিনে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের জন্য যে চিন্তা করা হচ্ছে, শত শত বছর আগে মুনি-ঋষি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বেদের মধ্যে সেই কথাই বলে গেছেন। সুতরাং আধুনিক সাম্যবাদের আসল আসল কথাগুলো সবই বৈদিক সাম্যবাদে আছে।

স্বার্থান্বেষীর সঞ্চিত ধনকে বলা হ'ত 'বিফল ধন'—যে ধন সকলের উপকারে লাগে না। কৃপণ, স্বার্থপর, অনুদার, পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে সঞ্চিত ধন কেড়ে নেবার বিধান বেদেতেই আছে।

প্রশ্ন :—আপনি তো বললেন, এখানকার সাম্যবাদের মূল নীতিগুলি বৈদিক সাম্যবাদেও ছিল। কিন্তু এখানকার সাম্যবাদীরা অর্থাৎ কমিউনিষ্টরা তো ধর্মের নাম শুনলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করে? ওদিকে বৈদিক নীতি তো ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ দিক থেকে দুই সাম্যবাদকে মেলাব কি করে?

উত্তর :—কমিউনিষ্টরা যে-ধর্মকে মানে না, সে ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়—ধর্মের বিকৃত রূপকে তারা মানে না। কারুরই তা মানা উচিত নয়। বেদ যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্মের অর্থ হচ্ছে—যা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমানভাবে ধারণ করে আছে, সেই ধারণ ক্ষমতাই হলো ধর্ম। এই ধর্মকে সকলেই মানে—সকলকেই মানতে হবে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সমানভাবে ধারণ করে আছে যে শক্তি—তাই ধর্ম।

বেদ হচ্ছে জ্ঞান। বিদ্ শব্দ থেকে এর উৎপত্তি—যার অর্থ হলো 'জানা'। বেদ হলো এমন একটি মাইক্রোসকোপিক যন্ত্র, যার মধ্য দিয়ে তাকালে জগতের সত্যরূপটাকেই জানা যায়। বেদের ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির সত্যরূপকে জানিয়ে দেওয়া। প্রকৃতির সেই সত্যরূপকে তো কমিউনিষ্টরা কখনই অস্বীকার করে না! তারা কি সূর্যকে মানে না? অগ্নি দেখলে কি তারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে? তা তো নয়। এই সূর্যই বেদে 'পূষা' নামে অভিহিত। বায়ু, জল, বিদ্যুৎকে কি তারা তাচ্ছিল্য করতে পারে? বেদে এদেরই বন্দনা করা হয়েছে মরুৎ, বরুণ, ইন্দ্র নামে। বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলা হয়েছে—তারা সর্বত্র একত্র বিচরণ করে; কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের দুইটি অশ্ব তাদের বাহন। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্যেরই দুই গতির রূপ। সূর্যের আলো ও ছায়া এদের দুই অশ্ব। এরা সর্বদাই গতির মধ্যে আছে। সূর্যের গতির উপর নির্ভর ক'রে দিন ও রাত্রির আসা-যাওয়া বা বিভিন্ন ঋতুর বিবর্তন—একথা কি কমিউনিষ্টরা অস্বীকার করতে পারে? এখনও কোন শক্তি বা forceকে বোঝাতে গেলে সেই Horse-powerই বলে। Space and Time বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের দুইটি মূল নীতি বলে গৃহীত; বেদে তাদেরই বলা হয়েছে ব্যোমদেব ও যমদেব—অনন্ত আকাশ আর মহাকাল। এছাড়া নদী, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি তেত্রিশটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুই ছিল বেদের দেবতা। এই তেত্রিশটি অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য স্মরণীয় বস্তুর প্রতিটির শক্তি ছিল এককোটি বস্তুর সমান। সেটাই বিকৃত হ'তে হ'তে আজ 'তেত্রিশকোটি দেবতা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং সেই বিকৃত রূপকে যদি কেউ মানতে না চায়, তবে তো দোষের কিছু নেই!

> বেদ অর্থ জ্ঞান। প্রকৃতির সত্য-রূপকে জানিয়ে দেওয়াই বেদের ধর্ম। এই সত্য-রূপকে কমিউনিষ্টরাও অস্বীকার করে না।

বেদের সমস্ত কিছুই বিজ্ঞানভিত্তিক। একদল স্বার্থান্বেষী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেদের প্রকৃত ধর্মকে একটি মনগড়া কাল্পনিক

অর্থ দিয়ে বিকৃত করে তুলেছে। ধর্মকে জানার বস্তু থেকে টেনে এনে ভয়ের বস্তু করে তুলেছে। তারই ফলে আজ সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ; ভয় দেখিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী মোহান্তরা ধর্মের নামে একচ্ছত্র ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। এই সব তথাকথিত ধর্মের দালালরা পুঁজিবাদী শোষণবাদীদেরই শ্রেণীভুক্ত। যারা ধর্মের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে ধর্মের নামে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করছে, তারা সমাজের বন্ধু নয়। এদের প্রচারিত ধর্মকেই সাম্যবাদীরা মানতে চায় না—এই আফিংএর প্রভাব থেকে নিজেদের মোহমুক্ত রাখার জন্যই তারা ধর্মকে বর্জন করেছে। এই বিকৃত ধর্মকে আমিও মানি না। বেদের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে এদের দূরে সরিয়ে দিতেই হবে।

বেদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক----সেখানে ভয়-ভীতি, কল্পনা-কুসংস্কারের স্থান নেই।

সাম্যবাদীরা হবে universal tune-এর অনুসরণকারী। কমিউনিজমের ভিত্তি সেই সমসুরে বাঁধা। এই পৃথিবীতে সকল জীবেরই সমান অধিকার—প্রকৃতির প্রশাসন সম্পূর্ণ কমিউনিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বস্রষ্টাকে কেউ 'নাই' দিয়ে মানছে, কেউ 'আছে' দিয়ে মানছে ; গভীর ঘুমে এক একজনের এক এক ভাবে দৃষ্টিভঙ্গিমা খুলছে। কেউ দেশ-জাতিকে সেবা করা বড় মনে করে, কেউ বনে গিয়ে সাধনা করাটা বড় মনে করে। কে বড় কে ছোট, তা কিছু বলা হচ্ছে না। বাইরের দিক থেকে তাড়াতাড়ি যেটা আসে সেটাই লোকে দেখে। সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে একজন মহাপুরুষ হলেন, সেখানে তিনি বসে বসে বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করছেন ; এদিকে কর্মীরা বহু পরিশ্রম করে কোন একটি কাজে successful হলো। ভক্তেরা রটালেন—তাঁর আশীর্ব্বাদেই সব কিছু সম্ভব হলো।—সেখানেই ক্ষেপে উঠছে কর্মীরা—'করলাম আমরা, আর সেখানে বসে বাহাদুরী নিচ্ছে সে!' যে জিনিষ প্রমাণ করা যাচ্ছে না—সে রকম কথা না বলাই ভাল। সাধু গুরু মহান যাঁরা আছেন, তাঁরা যে দেশের জন্য কল্যাণ কামনা করেন না, তা বলছি না।

তবে যাঁরা নীরবে কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদের নীরবে থাকাই ভাল। ভক্তদের মাধ্যমে ঐরকম অযথা প্রচার না হওয়াই সমীচীন। সমস্ত জগৎ কণাশক্তির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি কণা এক একটি কর্মী। প্রতিটি কর্মীর শক্তি একত্র হয়েই গড়ে উঠেছে দেশ ও জগৎ, গড়ে উঠেছে আমাদের এখানকার সর্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মূলেই কর্মীদের কর্ম ও পরিশ্রম। কর্মীরা পরিশ্রম করে,—সমবন্টন থেকে বঞ্চিত হলেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন :—আপনি যে বলছেন, ধর্মের ক্ষেত্রে আজ নানারকম অঘটন ঘটে চলেছে—এই 'অঘটন' বলতে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আর একটু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ—ভারতবাসী স্বভাবতঃই ধর্মপ্রাণ। তাদের অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে মূলধন করে ধর্মের নামে আজ সমাজে যে ব্যবসা চলেছে, বেদে তাকেই 'অঘটন' বলে উল্লেখ করেছে। সেন্টিমেন্টের ব্যবসা অঘটন ছাড়া আর কি? সাধারণের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে একদল 'গুরু', 'মহান' সাজল। তাদের মধ্যেই কয়েকজনকে ভক্ত, চেলা সাজিয়ে ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে চিন্তা করতে লাগল—কি করে নিজেদের সঞ্চয় বাড়ান যায়, যেমনভাবে নিলামের মালের দর বাড়ান হয়। ভেতরের বণ্টনের ব্যাপার আগেই ঠিক করে বাইরে চলতে থাকে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। নানা রকম ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে মানুষকে বিস্মিত, বিভ্রান্ত করে দিয়ে, আনুষঙ্গিক নানারকম কার্যকলাপ করে তাদের মন জয় করে যেন-তেন ভাবে ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলে। আজকাল আবার অনেক জায়গায় প্রতিনিধি দিয়েও শিষ্যসংখ্যা বাড়ান হচ্ছে। এগুলোই তো 'অঘটন'।

তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই, অনেকে হয়তো পেয়েছোও, একটা করে পোষ্টকার্ড—তাতে 'অমুক বাবার' নামে, কিম্বা 'অমুক সন্ন্যাসীর' নামে দিব্যি দিয়ে লেখা আছে—'এই কার্ড পাওয়া মাত্র এই রকম আরও নয়টা পোষ্টকার্ড copy করে নয় জনের কাছে পাঠাবে, তাহ'লে নয় দিনের

মধ্যে এর একটা সুফল পাওয়া যাবে; না দিলে নয় দিনের মধ্যে মহাবিপদ।' মানুষের মন এমনই কুসংস্কারে আবদ্ধ যে, তারা বুঝছে এটা কিছু না, তবুও ভয়ে ভীতিতে প্রত্যেকেই আবার চিঠি লিখে চলেছে। প্রকৃতির নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে যা কিছু ঘটে চলেছে, তাই ঘটনা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে জোর করে যেটা ঘটান হচ্ছে—সেটাই হচ্ছে অঘটন। চিঠি লেখার ব্যাপারটা যে একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেটা বুঝতে তো অসুবিধা নেই! হয় সেই অমুক পাহাড়ের বাবার প্রচার, না হয় মানুষের সেন্টিমেণ্টের সুযোগ নিয়ে পোষ্টকার্ডের ব্যবসা চালু রাখার উদ্দেশ্যেই এটা শুরু হয়েছিল। যেখানে মাসে একটা পোষ্টকার্ড কিনলে হয়ে যায়, সেখানে দশটা কিনতে হচ্ছে। নিজেদের একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এটা করা। সে কথা বুঝেও আজ আমরা সংস্কারকে কাটাতে পারছি না। একটা দিব্যির ঠেলাতেই এই! ধর্ম্মস্থানে তো এর চেয়েও বেশী। সাধারণ, সরলপ্রাণ, নিরীহ ভালমানুষদের সেন্টিমেণ্টের সুযোগ নিয়ে মন্দভাগ্য, কর্মফল, গ্রহের দশা, স্বপ্নাদেশ ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, তাবিজ-কবচের নামে ঘটে চলেছে কত অঘটন! কত যে ফন্দি, কত যে ফিকির শুরু হলো —মুক্তি হবে, স্বর্গবাস হবে, সুখে শান্তিতে থাকবে। —কে কার উপর দিয়ে টেক্কা মারবে, তারই যেন প্রতিযোগিতা! কেউ মঠ করছে, কেউ মন্দির করছে, কেউ বা আশ্রম করছে। ধর্মের নামে ব্যবসা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তার আরও দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। মা-বাপের প্রতি সকল সন্তানেরই স্বাভাবিক একটা সেন্টিমেণ্ট থাকে। এ সেন্টিমেণ্ট আরও বেড়ে যায় তাঁদের দেহরক্ষার পর। হয়তো কোন সন্তান পিতার পিণ্ড দিতে গেছে, তাকে বলা হলো—'অমুক' লাগবে, 'তমুক' লাগবে, 'হ্যান' চাই, 'ত্যান' চাই। প্রথম সে খুসীতে করল। কাজ আরম্ভ হতেই দেখা গেল, রাস্তা থেকে আরম্ভ করে মন্দির পর্য্যন্ত প্রতিটি

প্রকৃতির নিজস্ব স্বাভাবিক গতিতে যা কিছু ঘটে চলেছে তাই 'ঘটনা'। আর উদ্দেশ্যমূলক ভাবে জোর করে যেটা ঘটান হচ্ছে সেটাই 'অঘটন'।

দুয়ারে দুয়ারে শতেক ব্যক্তি হাত পেতে আছে। প্রত্যেকেই বলছে, এটা না দিলে বাপের উদ্ধার হবে না, ওটা না করলে তোমার হাতের জল শুদ্ধ হবে না। পিতা-মাতার ব্যাপার, না দিলে সত্যিই যদি উদ্ধার না হয়! তাই কষ্ট হলেও দিয়ে গেল। এতেও শেষ না। দিতে দিতে শেষে এসে ঠেকেছে ঝাড়ুদারের হাতে। ঝাড়ুদার বলছে—'একটা ঝাঁটার বাড়ি না খেলে তোমার পাপ দূর হবে না, বাপের উদ্ধার হবে না।' এখানেও সেই সেন্টিমেন্টের ব্যবসা। সন্তান ভাবল, এতই করলাম, এতই খরচ হলো—এতজনের এত চাহিদা মেটালাম, আর একটা ঝাঁটার বাড়ির জন্য সব ঠেকে থাকবে? এতে যদি বাবা মুক্ত হয়ে যান, তবে একটা কেন, না হয় দু'চারটা খেলামই। কিন্তু তাতেই কি সব? ঝাঁটার বাড়ি এমনি এমনি দেওয়া হবে না, কিছু চাই। কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, একবার দেখো! কি করলে মানুষের মনে লাগবে, মানুষ বাধা-বাধকতায় এসে পড়বে, তারই চিন্তা করে নানা কৌশলে, নানা ফন্দি-ফিকির করে চলেছে সেন্টিমেন্টের ব্যবসা। এর ফলে, অনেক সাধুব্যক্তি আছেন যাঁরা সত্যিই মহান, উদার এবং বেদগত ও দেশগতপ্রাণ, যাঁরা মনে-প্রাণে সন্ন্যাসী, তাঁরাও আজ ঠগের ছকে পড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যখন চিৎকার করে সকলকে জানাতে চেষ্টা করছেন—দেশ আজ 'উজবুকের দেশে' পরিণত হতে চলেছে, এখনও সাবধান হও, তখন আবার অনেকে মনে করছে, এটাও হয়তো ব্যবসার আর একটি চাল। কিন্তু তা নয়। সত্যিই দেশ আজ উজবুকের দেশে পরিণত হয়েছে। সিংহ-শাবকদের ভেড়া করে রাখা হয়েছে। সেই যে গল্পে আছে—এক রাজ্যে নরবলি হতো। রাজা দুই বিদেশীকে ধরে এনেছেন বলি দেবার জন্য। দুই বন্ধু ভাবছে, কি করে মুক্তি পাওয়া যায়? সারারাত ধরে তারা পরামর্শ করল। সকালে রাজার লোক এলো, একজনকে বলির জন্য নিয়ে যেতে হবে। এসে দেখে, দুই বন্ধু তুমুল ঝগড়া শুরু করেছে—এ বলে, 'আজ বলিস্থানে আমি যাব', ও বলে 'না, আমি যাব।' ঝগড়া থেকে হাতাহাতি শুরু হলো। রাজা খবর পেয়ে ছুটে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? দুই বন্ধুই

হাত জোড় করে বললে—'মহারাজ, কাল রাত্রে আমরা ছ'জনে স্বপ্ন দেখেছি, আজ যাকে বলি দেওয়া হবে—তার অনন্ত স্বর্গবাস।' তারপরেই মহারাজের দুই পা জড়িয়ে ধরে দুই বন্ধুর কাকুতি-মিনতি—এ বলে 'আমাকে আজ বলি দিন', ও বলে 'আমাকে উৎসর্গ করুন।' মহারাজ ভাবলেন—আমার কাঠগড়ায় বলি হয়ে অন্যরা স্বর্গে যাবে? আচ্ছা রাখ। এই সুযোগ! তারপর নিজেই স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে কাঠগড়ায় মাথা পেতে দিলেন।—এই হলো আমাদের দেশ, আর এই হলো আমাদের দেশের লোক। এমনই উজবুক, এমনই সরল, এমনই ধর্মভীরু যে, তারা বুঝতেও পারে না কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা। যা বোঝান হয়, তাই বোঝে। তাদের সেই ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে, তথাকথিত সাধুসন্ন্যাসীরা নিজেদের সঞ্চয় বাড়িয়ে চলেছে—আর কতকগুলো ভিক্ষুকের সৃষ্টি করছে।

আদি বেদে 'আশ্রম' 'সাধু', 'সন্ন্যাসী', 'ত্যাগী', 'মহান', 'উদার', 'বিরাট' এই উপাধিগুলো কোন বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে উল্লেখ করে বলা হয় নি। কথাগুলো সবই বেদে আছে; বিভিন্ন শ্লোকে এদের গুণ বর্ণনা করা আছে। সেই গুণগুলি আমরা যেখানে, যার মধ্যে ঠিক ঠিক দেখতে পাব, তাকেই সেই উপাধিতে ভূষিত করতে পারব। যেমন ধর 'আশ্রম' কথাটা। বেদ বলছে 'যেখানে আশ্রয় পাওয়া যায় তাহাই আশ্রম।' সেদিক থেকে পিতামাতাও আশ্রম। 'মন যার দ্বারস্থ হয় তাহাই মন্দির।' সংসার হচ্ছে সর্বোত্তম মন্দির। 'সৎভাবে জীবনযাপন করাই সন্ন্যাস।' তার জন্য মস্তক মুণ্ডন করতে হয় না, গেরুয়াও ধারণ করতে হয় না কিম্বা ফোঁটা তিলক কাটারও প্রয়োজন হয় না। যখন যেভাবে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি সৎভাবে জীবন যাপন করে, তাকেই বেদ সন্ন্যাসী আখ্যা দিয়েছে। এইভাবেই 'ত্যাগী' 'উদার' 'মহান' কথাগুলো বেদে ব্যবহৃত হয়েছে।

যেখানে আশ্রয় পাওয়া যায় তাহাই 'আশ্রম'। মন যার দ্বারস্থ হয় তাহাই 'মন্দির'। তাই পিতামাতা—আশ্রম, সংসার—মন্দির। সৎভাবে জীবন যাপন করাই হলো 'সন্ন্যাস'।

নিজের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা না করে অন্যের উপকারের জন্য যে সবকিছু অনায়াসে দিয়ে দিতে পারে, সেই ত্যাগী। বাইরে যতই দান ধ্যান করুক, ভেতরে ভেতরে নিজেরটা ঠিক রেখেছে,—তাকে কখনই ত্যাগী বা যোগী বলা হবে না। মা সন্তানের কাছে ত্যাগী। কারণ নিজের খাওয়া-পরার চেয়ে সন্তানের খাওয়া-পরার চিন্তাটাই তার কাছে বেশী। সন্তানের জন্য সে সব কিছু করতে পারে, এমন কি জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করে না। শুধু কর্তব্য নয়, এতেই তার আনন্দ। এই যে নির্দ্বিধায় মন-প্রাণ,শক্তি-সামর্থ্য সকল কিছু আনন্দের সঙ্গে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করা—এটাই হচ্ছে পরম ত্যাগী বা যোগীর অবস্থা। সেদিক থেকে মা হচ্ছেন পরম ত্যাগী ও সাধ্বী। এইভাবে মায়ের মত যিনি সমস্ত জাতিকে আপন সন্তান মনে করে তাদের কল্যাণার্থে সব কিছু সঁপে দিতে পারেন, তিনিই হলেন উদার, মহান, তিনিই হলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। এর জন্য আলাদাভাবে জঙ্গলেও যেতে হয় না, দণ্ডও নিতে হয় না। প্রত্যেকের মনেই সন্তানের জন্য স্নেহ, ভালবাসা, উদারতা আছে। সেগুলিকেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে ব্যাপকতায় ছড়িয়ে দিলে আর কোন ভাবনা থাকে না। যিনি সে চেষ্টা করেন, তিনিই সাধক। তুমি হয়তো বলবে—নিজের সন্তানের জন্য যতটা স্নেহ, অপরের সন্তানের জন্য ততটা স্নেহ আসে না, কি করব? এটা খুবই সত্য, বাবা-মা তার নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য যতটা করবে, ভাইয়ের ছেলে-মেয়ের জন্য ততটা করবে না। আবার জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইএর ছেলে-মেয়ের বেলায় ভালবাসার পার্সেণ্টেজ আরও কমে যায়। সে ক্ষেত্রে কি করবে? একান্নভুক্ত পরিবারের কি হয়? সকলের জন্য হাঁড়িতে অন্ন-ব্যঞ্জন রান্না হচ্ছে, সেখান থেকেই সকলের খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। একই অন্ন সকলে ভোগ করছে বলে কেউই সেখানে ভেজাল মেশাতে পারছে না। কারণ, ভেজাল মেশালে নিজেকে এবং নিজেদের সন্তানদেরও সেই ভেজালমিশ্রিত খাদ্যই গ্রহণ করতে হবে, তাই ভেজাল মেশানর কথা চিন্তাও করতে পারে না। ঠিক সেই রকম সকলের স্নেহ-ভালবাসা এবং

সকলের জন্য স্নেহ-ভালবাসা এক জায়গায় সঞ্চয় করতে হবে। সেখান থেকেও স্নেহের ধারা, প্রেমের ধারা, সকলের জন্য সর্বদিকে সমমাত্রায় ছড়িয়ে পড়ুক। তবেই সমস্যার বাঁধ সেই ধারার গতিতে আপনি ভেসে যাবে। বেদেও এই ধরণের ইঙ্গিত আছে। সেখানে বলছে, সকলের অর্জিত ধন এবং ধান একই জায়গায় সঞ্চয় করা হোক। সেই সাধারণ জায়গা থেকে যে যার প্রয়োজন মত বস্তু নিয়ে যাক। তার ফলে এতে কেউই ভেজাল মেশাতে পারবে না। কারণ, যে মেশাবে, তাকেও তো আবার সেখান থেকেই জিনিস নিতে হবে। সুতরাং নিজের কথা চিন্তা করেই সে অন্যের ক্ষতি করতে চাইবে না।—যেভাবে এতবড় জীবনবীমার ব্যবসাটা চলছে। নিজের জীবন সহজে কেউ দিতে পারবে না—এই সহজ সত্যটা জানা আছে বলেই লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এতগুলো টাকার রিস্ক নিতে পেরেছে। কয়েকশ' টাকা প্রিমিয়ম নিয়ে হাজার হাজার টাকা ইন্সিওর করার পর কোম্পানি তো তাদের ক্লায়েন্টের পেছনে লোক পাঠায় না—তারা কোথায় গেল, কি খেলো ইত্যাদি জানার জন্য! তারা জানে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জীবন ঠিকই রক্ষা করবে। তার জন্য পাহারার দরকার হবে না। 'আত্ম' অর্থাৎ নিজের প্রতি মায়া সকলেরই আছে। এই নিজের বা আত্মীয়ের গণ্ডিটাকে যদি বড় করে টানা যায় অর্থাৎ অনেক দূর পর্যন্ত তার সীমানাটা বিস্তৃত করা যায়, তবে সকল কিছুই নিজের মধ্যে এসে পড়বে। যেমন ধর, আমার পরিবারের লোকদের আমার ভাল লাগে। চিন্তাটাকে আর একটু ব্যাপক করলে আমার গ্রামের সব লোকদেরই আমার ভাল লাগবে। নিজেকে বাঙ্গালী ভাবলে সমস্ত বাংলাদেশের লোকদেরই নিজের মনে হবে। 'আমার'-টাকে আরও বাড়াও—মনে কর তুমি ভারতবাসী, তবে ভারতের সব লোক তোমার আত্মীয় হয়ে গেল। মনটাকে আরও প্রসারিত কর; গ্রহান্তরে নিয়ে গিয়ে ফেল, তখন তুমি পৃথিবীর লোক—বিশ্ববাসী তোমার আত্মীয়। এইভাবে মনটাকে আরও, আরও টানতে থাক; দেখবে সবার জন্য তুমি ভালবাসা অনুভব করছ, সকলকে তোমার ভাল লাগছে, প্রত্যেককে

তোমার আপন মনে হচ্ছে—সবাই তোমার আত্মীয়ের মধ্যে এসে পড়ছে। এইভাবে সকলেই যখন সকলকে আপন বলে, নিজের বলে মনে করবে, তখন আর কোন সমস্যাই থাকবে না। সেটা খুব কঠিন কাজ বলে আমি মনে করি না। কারণ, প্রকৃতির নীতি ও রীতি অনুযায়ী এটাই স্বাভাবিক, এটাই ঘটনা। আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ যা ঘটে চলেছে, তাহাই অঘটন।

প্রকৃত ধর্ম আজ কতটা বিকৃত, তা একটা উদাহরণেই বুঝতে পারবে। —সহস্র লোক কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কীর্তনের পদটি হচ্ছে 'পতিতে তারিতে হবে তারিণী'। মিছিলের সামনের দিকের লোকেরা ঠিকই গাইছে, কিন্তু পিছনের লোকেরা গেয়ে চলেছে 'পঁচিশে তারিখে হবে বারুণী'। এই গানেই তারা তাল দিয়ে চলেছে। মিছিলে যত নতুন লোক এসে যোগ দিচ্ছে, সকলেই চিৎকার করে এই গানই গাইছে। গানের সুরে আর মুখরোচক পদে সকলে এমনই মুগ্ধ এমনই মত্ত যে, এটা যে কীর্তনের পদ নয়, হতে পারে না, সে কথা আর কারুরই মনে আসে না। দু'-একজন, যাদের মনে কখনও উদয় হয় 'এটা তো হতে পারে না', তারা তখন একে 'ভোগলামি', 'ব্যবসা' ইত্যাদি বলে মিছিল ছেড়েই চলে যায়। আমাদের দেশে 'ধর্ম' আজ এই অবস্থায় এসেছে; 'পতিত উদ্ধার' আজ 'বারুণী উৎসবে' পরিণত। সেই জন্যই ধর্মের নামে আজ অনেকের মনে ভয়, ভীতি, সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে—তারা একে এড়িয়ে চলছে। কিছুসংখ্যক আবার ধর্মকে মিথ্যা, ভণ্ডামি বলে উড়িয়েই দিচ্ছে। আর বেশীর ভাগ লোক এর বিকৃত রূপ নিয়ে এমনই মশগুল হয়ে আছে যে, তাদের কিছু বলতে গেলেই তারা তেড়ে মারতে আসছে। কিন্তু সত্য তো উদ্ধার করতেই হবে। তাই বলছিলাম, যারা এ লাইনে আছে, তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ তার কথা, তার চিন্তাধারা যতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণীয়, অন্যদেরটা তত নয়। কারণ, সাধারণ ব্যক্তিরা কল্পনা ও ধারণার থেকে বলে। আমি এই লাইনে আছি। আমি বলছি, প্রকৃত ধর্ম ভীতির

বস্তু নয়, প্রকৃত ধর্ম কল্পনার বস্তু নয়, প্রকৃত ধর্ম অলীক বস্তু নয়, প্রকৃত ধর্ম অস্বাভাবিকও নয়। ধর্মের নামে যা আজ দেখতে পাচ্ছি, সেটা ধর্মের একটা বিকৃত রূপ। সেই বিকৃত রূপের নেশায় আজ সকলে মত্ত বলেই সত্যরূপ আর চোখে পড়ছে না। ধর্মের নামে আজ যা চলছে, সেটাই বরং বেঠিক। যখনই তোমরা বুঝতে পারছ,—এটা ঠিক নয়, তখনই তোমাদের বোঝা উচিত, একটা তবে ঠিক-বস্তু আছে। তা না হলে বেঠিকটা হলো কি করে? ছায়া যখনই দেখবে, তখনই বুঝবে, আলো নিশ্চয়ই আছে। আলোটাকে খুঁজে বের করতে হবে, ছায়া দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলে আলোটাকেও যে ছাড়তে হয়।

ছায়া যখনই দেখবে, তখনই বুঝবে—আলো নিশ্চয়ই আছে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে বলছেন, প্রকৃত ধর্ম আজ বিকৃত—প্রকৃত ধর্ম টা কি? ধর্মাচরণ বলতেই বা আমরা কি বুঝবো?

উত্তর ঃ—যাহা প্রকৃতিগত, তাহাই ধর্ম। সেই প্রকৃতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়ে, সেই অনুযায়ী কাজ করাই ধর্মাচরণ। তোমার যে দৈহিক ও মানসিক গঠন, কিভাবে তার সর্বাঙ্গীন্ বিকাশ সাধন করা যায়; তোমার যে সমাজ, তোমার যে পরিবেশ, কিভাবে তার উন্নতি ও মঙ্গল করা যায়; কিভাবে তাকে ক্রমশঃ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তার চিন্তা করা এবং সেইভাবে কাজ করাই হ'চ্ছে প্রকৃত ধর্ম।

প্রশ্ন করতে পার, কিভাবে আমরা বুঝব—এটা করলে মঙ্গল হবে, ওটা করলে হবে না? একটু চিন্তা করলে, একটু মনঃসংযোগ করলে নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে পারবে—কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়। ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না। এটা জীবেরই ধর্ম। ভেতরের সচেতনতার কাঁটাটা সব সময় একমুখী হয়ে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে—এটা ঠিক, ওটা ভুল; এটা ভাল, ওটা মন্দ। তা সত্ত্বেও অনেকে অনেক সময় কুকর্ম করে। করে ঠিকই, কিন্তু ভেতর থেকে ঠিক জানিয়ে দেয়—'এটা ক্রুটী করলে!' একজন শিকারী বাঘ মেরে

বা সিংহ মেরে বাহবা পেতে পারে, আর সেই বাহবা পাওয়ার নেশাতে আরও শিকার করে যায়; কিন্তু তার ভেতরকার যন্ত্র তাকে কখনও-না-কখনও ঠিকই জানিয়ে দেয়—'এ কাজটা ঠিক হচ্ছে না।' যদি তার মন-যন্ত্র বলে—'তুমি যা করছ, ঠিকই করছ', তবে অবশ্য বলার কিছু নেই। ভেতরের সেই সজাগের বাণী অনুযায়ী কাজ করে গেলেই আর কোন গোল থাকে না। আপন চৈতন্যের সাড়া অনুযায়ী আচরণ করাই ধর্ম। তার বিরুদ্ধাচরণ করাই অধর্ম। সুতরাং মনের সেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাও।

আপন চৈতন্যের সাড়া অনুযায়ী আচরণ করাই ধর্ম, তার বিরুদ্ধাচরণ করাই অধর্ম।

কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কোন্‌টা গ্রহণ করা উচিত, কোন্‌টা বর্জন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খুবই সচেতন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে বা না হবে, আমাদের sense organs কাজ করার আগেই সে বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে, সজাগ করে দিচ্ছে। দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রে যেমন কাঁটা সবসময় উত্তর-মুখী হ'য়ে পথিকদের দিক্ ঠিক করে দেয়, দিগ্‌ভ্রান্ত হলেও সেই যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে পথিক আবার তার নির্দিষ্ট দিক্ ঠিক করে নিতে পারে, তেমনি প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তাকে ঠিক দিক্ দেখিয়ে দিচ্ছে, চলার গতির দিকটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে—এটাই ধর্মের পথ, সত্যের পথ, কল্যাণের পথ; সুতরাং এ পথেই চল। আবার প্রকৃতি বা সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী সতর্কও করে দিচ্ছে—'এটা ঠিক নয়,—এটা উচিত নয়।' সেই সতর্কতার কাঁটার দিকে নজর স্থির রেখে পথ চললে দিগ্‌ভ্রম কখনই হবে না। মাঝে মাঝে সাংসারিক ঝড়ঝাপ্টায় পথ হারিয়ে ফেললেও আবার তাকে খুঁজে পাবে, গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছাবে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জিহ্বাতে একটা বিজাতীয় বস্তু এসে পড়লেই সে তাকে 'থু' করে তৎক্ষণাৎ ফেলে দিচ্ছে। চোখে যদি ধূলিকণা এসে পড়ে, স্বাভাবিকভাবে চোখের জল এসে তাকে বা'র করে

দেবে। সেইরকম সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সদাসর্বদা সতর্ক থাকে—সেখানে যাতে কোন ক্ষতিকারক কিছু এসে না পড়ে। অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ কিছু এসে গেলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সে তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে। যতক্ষণ সেটা না সরে যায়, ততক্ষণ সে ক্রমাগত যুদ্ধ করেই চলে। আর যেটা গ্রহণীয়, সেটাকে স্বাভাবিক-ভাবেই নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ করে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি,—শরীরের পুষ্টির জন্য তার কতখানি গ্রহণীয়, আর কতখানি বর্জনীয়—শরীরের ভেতরকার যন্ত্রগুলোই তা ঠিক করে দেয়। যা গ্রহণীয়, তা স্বাভাবিকভাবে রক্তে গিয়ে মেশে ; যা বর্জ-নীয়, তা আপনা থেকেই বেরিয়ে যায়। আবার অনেক খাবার আছে ---যা খুবই মুখরোচক, কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। সে ক্ষেত্রে সেই খাদ্য গ্রহণ করার আগেই মনের সতর্কতার যন্ত্রটি বলে দেবে--'এটা গ্রহণ না করাই ভাল।' আমাদের চিন্তা করার আগেই যেন সে তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়। সতর্কতার সেই বাণী না শুনে লোভের বশবর্তী হয়ে যদি কেউ কখনও সে খাদ্য খেয়ে ফেলে, তবে সেটাকে বা'র করে দেওয়ার জন্যই শরীরকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়—অর্থাৎ অসুখে ভুগতে হয়। ঠিক সেই রকম সতর্কতার কাঁটা দেখে কাজ না করলে সমাজকেও রোগে ভুগতে হয়।

শরীরের মত মনের ভেতরকার সমস্ত parts-গুলোও সবসময় জানিয়ে দিচ্ছে—তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ সেটা কল্যাণমূলক, না অপরাধমূলক। সেই নির্দেশ মেনে না চললেই শারীরিক ভোগের মত আসে মানসিক ভোগ। আর তার থেকেই শুরু হয় সামাজিক দুর্ভোগ, অশান্তি, অরাজকতা ইত্যাদি। সুতরাং মন-ইন্দ্রিয়ের সতর্কতার যন্ত্রের কাঁটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে, প্রকৃতির নিয়মকে উপেক্ষা না করে যদি চলা যায় তবেই জীবনটা হবে সহজ, সরল, সুন্দর ও স্বাভাবিক। সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে চলাই হচ্ছে সৎভাবে চলা, আর সৎভাবে চলাই হচ্ছে ধর্ম।

প্রকৃতির নিয়মগুলিকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখতে পাবে, চলার পথে কতভাবে, কতরূপে সে সতর্কতার ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে। এগুলো হচ্ছে natural gift—প্রকৃতির সহজাত দান। নিজের সুবিধামত এর থেকে কিছুটা নিলাম, আর কিছুটা বাদ দিলাম ; কখনও এর ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করলাম, আর কখনও করলাম না—তা হলে তো চলবে না। তাতে সুফল হয় না, বরং সফলতার পথে বিঘ্নই ঘটে। ব্যক্তির সফলতা কিম্বা সমষ্টির বা সমাজের সফলতা—সব কিছুই নির্ভর করে ভেতরকার যন্ত্রটি কী সাড়া দিচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার উপর।

আমাদের সমস্ত কাজই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই—অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্যেই। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের শুভ অশুভ চিন্তা করেই আমাদের কাজ করা উচিত। অথচ ভবিষ্যৎ সাধারণতঃ সকলের কাছেই প্রায় অজ্ঞাত। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি শুভ হবে, কি শুভ হবে না—জানবে কি করে? একটু চিন্তা করলে, একটু মনোনিবেশ করলে বুঝতে পারবে—প্রকৃতি আপনা থেকেই ভবিষ্যতের শুভ-অশুভের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। কোন কাজ করার পূর্ব মুহূর্তে মনে যদি কোন রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব না আসে, তখনই বুঝবে, সে-কাজ করা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। মনের কাঁটা যখনই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে, কোন জায়গায় স্থির হচ্ছে না—তখনই বুঝবে, সে কাজ করা সমীচীন নয়। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকেই আসে জিজ্ঞাসা ; তখন যারা অভিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। এইভাবে যতক্ষণ না মনের চেতনার ট্রান্সমিটারে সায় দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেই যাও। বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখবে, একজায়গায়-না-একজায়গায় কারুর-না-কারুর কথায় তোমার মন ঠিক সায় দেবে—'হ্যাঁ, এটাই ঠিক ; এইভাবেই কাজ করা উচিত।'

মনের সেই ইঙ্গিত কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। আবার অনেকে ধরতে পেরেও সেই অনুযায়ী কাজ করে না। বাইরের প্রভাবটাই

তার উপর বড় হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগতভাবেই হোক, আর সমষ্টিগত-ভাবেই হোক, মনের ইসারা না শুনে হুজুগে মাতলেই হোঁচট খেতে হয়। খাচ্ছেও তাই।

অনেকে আবার ভাবে—মনের সেই সতর্কতার ইঙ্গিতগুলো ভয়, ভীতি, দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ কথা ভুল। সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, মন-ইন্দ্রিয়ে, বিভিন্ন অণুতে পরমাণুতে সহজাত প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। মন ও শরীর একই ধাতুতে, একই বস্তুতে গড়া। জল ও বরফের মত মন ও শরীর একই বিষয়বস্তুর দুইটি রূপ। সুতরাং শরীরের মত মনেরও প্রতি-রোধক ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্ম যে, বাইরের কোন অণুবীক্ষণ বা পরমাণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তা ধরা পড়ে না। একমাত্র মন-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির কাঁটার কম্পনে তাকে ধরা যায়। সেটা চোখে দেখার বস্তু নয়, উপলব্ধির বস্তু। বাতাসের মত তা চোখে ধরা পড়ে না, অনুভূতিতে ধরা পড়ে। মনের এই যে সতর্ক করে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা, বেদ তাকে বলছে—চেতন শক্তি বা চৈতন্য। এই চেতন শক্তিই হচ্ছে জ্ঞান-বৃক্ষের বীজ। সেই বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ চেতনা যখন জাগে, তখন সেই বীজ থেকে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্কুরগুলির সৃষ্টি হয়, সেগুলিই হচ্ছে যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, বিচার, বিবেচনা ইত্যাদি। এই বুদ্ধি-বিচার বিবেচনার অঙ্কুর থেকে ঠিক ঠিক ভাবে যে উদ্ভিদ মনের মাটি ভেদ করে বাইরে প্রকাশিত হয়, তাহাই কর্ম—জ্ঞানবৃক্ষের কাণ্ড—কর্মকাণ্ড। এই বিবেচনাজাত কর্মকাণ্ডই বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে, ডাল-পালা বিস্তার করে ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবগুলির একত্রিত নাম হচ্ছে 'জ্ঞান'। সেই চেতনা থেকে উদ্ভূত জ্ঞানবৃক্ষের ফলই হচ্ছে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নতি, সমন্বয়, সহযোগিতা, সমাধান ইত্যাদি। এই জ্ঞানবৃক্ষকে আগাছা থেকে রক্ষা করতে পারলেই তার

আমাদের প্রতি কাজে মনের যে সতর্ক করে দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা—বেদ তাকেই বলছে চেতন শক্তি বা চৈতন্য।

সুপক্ক ফলগুলি পেতে আর বেগ পেতে হবে না। তবে সে বৃক্ষকে আগাছা থেকে রক্ষা করা দরকার। চেতনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে এদিক-ওদিকে কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেই বুঝতে হবে সেগুলি আগাছা—তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তা না হলে ক্ষেত্রের ক্ষতি, বৃক্ষের ক্ষতি, পরিবেশেরও ক্ষতি। আগাছার শক্তিও তো কম নয়! তাই সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করাই বিধি।

এই যে চেতনার বীজ থেকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জ্ঞানবৃক্ষের উৎপাদন, আগাছা থেকে তাকে রক্ষা করা, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে তাকে ঠিকমত বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করা, তার ফলগুলিকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগান—সেটাই ধর্ম। এছাড়া ধর্ম আলাদা কিছু নয়। এক বাক্যে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলাই ধর্ম। এক কথায় সত্যই ধর্ম।

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলাই হচ্ছে ধর্ম।

বীজ থেকে গাছকে বিকশিত করতে হলে যেমন আগাছার উৎপাটন করতে হয়, তেমনি সত্য বা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে, অসত্যকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাও ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে, কাল্পনিক গল্পকথা বলে কেউ যদি তোমায় বোঝায়—'এটা ক'রো না, ওটা কর; ওটা ঠিক নয়, এটা ঠিক'—মনের যন্ত্রে যাচাই না করে তাকে নির্বিচারে গ্রহণ না করাই ভাল। বেদ বলছে—তোমার সম্মুখে যা কিছু আসুক, যার কাছ থেকেই আসুক, তোমার যুক্তির যন্ত্রে ফেলে আগে তাকে তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করে বুঝে নাও; তারপর গ্রহণ কর। তোমার সেই যন্ত্রে যদি কোন রকম সায় না পাও, তবে অবিলম্বে সে চিন্তা বর্জন করবে। কারুর কথায় বা কোন কিছুর দোহাইতেও তাকে গ্রহণ করবে না।

ধর্মাচরণ করতে হলে, ভগবৎ দর্শনলাভ করতে হলে কামনা জয়ের সাধনা করতে হবে—এ কথা ভূয়ো। ভগবৎ দর্শনের ইচ্ছা—

সেটাও তো একটা কামনা। ঈশ্বর সম্বন্ধে জানা—সেটাও তো একটা বাসনা। শুধু 'নারীমুখ দর্শন করব না' বললেই কি কামনা জয় করা হলো, না কামনা জয়ের সাধনা হলো? নারী-সঙ্গের জন্য ছোটাছুটি—সেটা যদি কাম হয়, তবে সাধুসঙ্গের জন্য ছোটাছুটি—সেটাই বা কাম হবে না কেন? উভয় স্থানেই তো একই প্রতিক্রিয়া—সেই হা-হুতাশ—'উঃ আঃ', 'আর পারি না,' একটু দর্শনের জন্য, একটু স্পর্শনের জন্য ছোটাছুটি, কান্নাকাটি—বিরহ-বেদনা। কথা তো একই! তবে একটা ধর্ম, আর একটা অধর্ম হবে কেন? বেদ বলছে—'কাম কখনও বর্জন করা যায় না।' দেহ যতক্ষণ আছে, দেহের সহজাত বৃত্তিগুলোও আছে। একমাত্র শ্মশানে গেলে কামনা বাসনাগুলো সমূহ স্থগিত থাকে। তাও সেটা সাময়িক। যে বস্তুর দ্বারা শরীর গঠিত, শবের মধ্যে তো সেগুলি রয়েই গেছে। তার প্রতি-ক্রিয়ারও শেষ নেই। শবটিরও পরিবর্তন হচ্ছে—নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন আকার নিচ্ছে। তার থেকেই আবার সৃষ্টি হচ্ছে কত জীবাণু—জীবাণু থেকে জীব, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়, কত কি! কামনা না থাকলে সৃষ্টি কখনও হয় না, হতে পারেনা। সুতরাং দেখছ তো—শ্মশানের শবটিও কামনা ছাড়তে পারেনি। কেউই পারে না। কাম ত্যাগের উপরই যদি ভগবান পাওয়া নির্ভর করে, তবে আজ পর্যন্ত কেউ ভগবান পায়নি, পাবেও না। 'কাম ত্যাগ কর তবে ভগবানকে পাবে' এসব কথা হচ্ছে বোড়ের চাল, লোক ঠকান কথা। যাঁরা একথা বলেন—তাঁরাও সেটা ভাল করেই জানেন।

আমি সত্যই লজ্জা অনুভব করি একথা ভাবতে যে, আজও হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা বলছেন—'আমরা কাম বর্জন করেছি।' তাঁরা শুধু কৌপীনই কষেছেন—নাক, মুখ, চোখ তো বন্ধ করতে পারেননি! সেগুলো তো খোলাই আছে। কানে কি তাঁরা সীসা ঢেলে দিতে পেরেছেন? পেরেছেন চোখে ঠুলি বাঁধতে? নাক মুখ কি তাঁরা বেঁধে রেখেছেন? তবে একদিকের কষাকষিতে

কি হবে? সবই তো একই ইন্দ্রিয়শ্রেণীভুক্ত। সঙ্গীতের সুর যদি সাধনার বিঘ্ন না হয়, ফুলের গন্ধ যদি সাধনার বিঘ্ন না হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের কোন বৃত্তির নিবৃত্তিতেই সাধনার বিঘ্ন হবে না। নগ্নই থাক আর বহুমূল্য পোষাকই পর, প্রকৃতির নিয়মের পথে যদি ঠিক থাকা যায় তবে ধর্মাচরণে কোন কিছুই অন্তরায় হয় না।

সঙ্গীতের সুর, ফুলের গন্ধ যদি সাধনার বিঘ্ন না হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের কোন বৃত্তির নিবৃত্তিতেই সাধনার বিঘ্ন হবে না।

মনের যে কোন বৃত্তির উৎপত্তিই তো হচ্ছে 'কাম' থেকে। ইচ্ছাই হচ্ছে কাম। বৃত্তির নিবৃত্তিই হচ্ছে কামনার চরিতার্থতা। শুধু নারী-পুরুষের সঙ্গমই কাম নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধনই কাম। চোখের তৃপ্তি, কানের তৃপ্তি, নাকের তৃপ্তি, ত্বকের বা জিহ্বার তৃপ্তি যদি ধর্ম সাধনার অন্তরায় না হয়, তবে একটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনই বা কেন ধর্মের পথে বাধা সৃষ্টি করবে? সব ইন্দ্রিয়ই তো লিঙ্গবৎ। এর কোনটাই ধর্মসাধনার অন্তরায় নয়। বরং এগুলোকে জোর করে অস্বীকার করলেই ধর্মের পথে—সত্যের পথে চলার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়! যত তাদের অস্বীকার করে ঠেলে ফেলে দিতে চাইবে, তত তারা অন্য অন্য রূপ নিয়ে, কৌশল করে, ছদ্মবেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারই ফলে গজিয়ে ওঠে যত অসামাজিক কাজের আগাছা—চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি, মারামারি, হানাহানি, রাহাজানি, এতে ভেজাল মেশান, ওতে আগুন লাগান, ওর পেছনে লাগা, ওর সমালোচনা করা ইত্যাদি। এ সমস্তই আগাছা। চেতনার বীজ থেকে এদের উৎপত্তি নয়, এগুলিকে তাই বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এগুলিই অধর্মাচরণ। এগুলো থেকেই সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, অশান্তি। সমাজে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়—যার ফলে এমন সুন্দর সাজান জিনিস চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যায়।

কাম যখন বর্জন করা যায় না, তখন কামকে জয় করার চেষ্টা না করে তাকে মেনে নিয়ে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে

যাওয়াই তো ভাল, সেটাই ধর্ম। বেদ যে বলছে—স্বধর্মে নিধন হওয়া অনেক ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ—সেই স্বধর্ম বা পরধর্ম বলতে হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। স্বধর্ম হচ্ছে—সহজাত যে ধর্ম, আর পরধর্ম হচ্ছে—সহজাত ধর্মের বিপরীত যে আচরণ। এখন 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়' কথার অর্থ—জীবের সহজাত ধর্মে অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মে যদি ঠিক থাকা যায় তবে সেটাই ভাল হবে—সেটাই প্রকৃত ধর্মাচরণ। আর তাকে অস্বীকার করে তার বিপরীত কিছু যদি করতে যাও তবে সে 'পরধর্ম ভয়াবহ'—অর্থাৎ তাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করছি বলেই আজকে আমাদের দেশের ও সমাজের এই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে।

বেদে স্বধর্ম এবং পরধর্ম অর্থে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রভৃতির স্ব-স্ব ধর্ম বা বিজাতীয় ধর্মকে বোঝান হয়নি। বেদের স্বধর্ম অর্থ—সহজাত যে ধর্ম, আর পরধর্ম হচ্ছে—সহজাত ধর্মের বিপরীত যে আচরণ।

আজও চারিদিকে এমন অনেক লোক আছে, যারা পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, দেব-দেবীর দোহাই দিয়ে সমাজকে শুধু দোহন করেই চলেছে। সে দোহনে দুধ আসছে না, রক্তই শুধু নিঃশেষিত হচ্ছে। এরা অনিষ্টকারী, আগাছা সৃষ্টিকারী। এদের আমল না দেওয়াই ভাল। এরকম যেখানে দেখবে, লাঠি সেখানে ধরবে। ক্ষমার প্রশ্ন তো ওঠেই না! বরং সে ক্ষেত্রে লাঠি যদি না ধর, সে অপরাধ তোমাতে বর্তাবে। তাই বলছি—পাপপুণ্যের দোহাইকে নর্দমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিবেকের দোহাই অনুযায়ী কাজ কর।

পাপ-পুণ্যের দোহাইকে নর্দমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিবেকের দোহাই অনুযায়ী কাজ কর।

এই যে আমি বলছি—'তোমার চেতনার কাঁটা যে দিক নির্দেশ করছে, সেইভাবে কাজ কর'—এটাকেও আমি বিনা বিচারে গ্রহণ করতে বলি না। ফেল তাকে তোমার মনের যন্ত্রে, দেখ কম্পাসের কাঁটা কোন্

দিক্ নির্দেশ করছে, বোঝ তার ইঙ্গিত; তারপর সেই অনুযায়ী কাজ কর। দেখবে, আমি যা বলছি, তোমার চেতনার যন্ত্রও সেই কথাই বলছে। বাইরের প্রভাবে একথা হয়তো অনেকে অনেক সময় স্বীকার নাও করতে পারে; কিন্তু মনের ফাঁকি চলে না! সেখানে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। মনের ডাকে সাড়া না দিয়ে বাইরের ডাকে সাড়া দেওয়া হচ্ছে বলেই আজকের সমাজে এত অশান্তি, এত অবিচার, এত অনাচার, এত অরাজকতা; দরদের বদলে এত গলদ।

যা নেই, তা কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা আছে, তাকে কখনও অস্বীকার করাও যাবে না। তুমি যেখানে আছ, সত্যবস্তু—নিত্যবস্তু সেই একই জায়গায় আছে। দেবতাকে চাও? তাকে মাটিতেই সন্ধান কর। এই জীবজগতের প্রতিটি জীবকে, প্রতিটি বস্তুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ কর; দেখবে, তার মধ্যেই দেবতার মূর্তি, দেবতার পূর্ণ রূপ খুঁজে পাবে। দেবতা কে? কি তার অর্থ? বেদ বলছে 'যিনি দান করেন তিনিই দেবতা'। কী দান করেন? না, আলোক দান করেন—জ্ঞানের আলোক। দীপ যেমন তার আলোকে সব কিছু দীপন (উজ্জ্বল) করে, তেমনি যে তার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সহজাত দানগুলিকে, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দীপন করছে অর্থাৎ আলোকিত করে দেখিয়ে দিচ্ছে—এটাই ঠিক, এটাই সত্য, এটাই নিত্যবস্তু—সেই দেবতা। প্রকৃতির সহজাত বিষয় বা গুণ সবার মধ্যেই আছে। সে গুণগুলিকে যে নিজের মধ্যে স্বচ্ছভাবে, দীপ্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে সেই দেবতা। যার ভেতর দিয়ে বিরাটের সুর প্রকাশিত, বিরাটের রূপ প্রস্ফুটিত, সর্ব গুণে যে গুণান্বিত, সেই সর্বগুণে গুণময়ই হচ্ছে দেবতা। সেই দেবতাকে খুঁজতে তো স্বর্গে যেতে হবে না, এ জগতেই তাকে পাওয়া যাবে। প্রকৃতির প্রতিটি জীবে, প্রতিটি বস্তুতে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে সে প্রকাশিত। তার যে কোন

বেদে 'দেবতা' অর্থ দাতা অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের আলোক দান করেন—প্রকৃতির সহজাত শক্তিগুলিকে বিকশিত করে যিনি দেখিয়ে দেন—এটাই ঠিক, এটাই সত্য, এটাই নিত্যবস্তু।

একটি ধারা ধরে ধারাবাহিকভাবে যদি বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যেতে পার, ঠিকমত সাধনা করতে পার, তবে দেখবে কত রহস্য তার মধ্যে। সেই রহস্য যত ভেদ করতে পারবে, ততই তোমার মনের প্রসারতা বেড়ে যাবে ; আর বস্তুর বিশ্লেষণের ফলে কত নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। তুমি যা চাচ্ছ তার সব কিছুই এর মধ্যে খুঁজে পাবে। জীবনের চলার পথকে সেগুলি সহজ করে তুলবে, ক্রমশঃ উন্নততর করে তুলবে। অনেক বাস্তব সমস্যা সমাধানের সাথে সাথে জাতি ও জীবন, সমাজ ও স্বদেশ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে।

সৃষ্টির রহস্যের একটি ধারার বিশ্লেষণেই এই, আর তার সব ধারাগুলি যদি ধ'রে ধ'রে ধাবিত হওয়া যায়, ধ্যান করার মত ধর্ণা দিয়ে লেগে থাকা যায়, তবে তো কোন কিছুই আর ধাঁধার মধ্যে থাকবো না। ধীরে ধীরে সব ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে। যা ধ্রুব, যা সত্য—তা ধ্বনিত হয়ে উঠবে। তখন স্বর্গের পেছনে আর ধাবিত হতে হবে না—ধরাই স্বর্গধাম হয়ে উঠবে। তুমি তোমার ইষ্টকে সেখানেই ধরতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ—কমিউনিষ্টরা কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেশে না—এটা কেন ?

উত্তরঃ—এখানকার ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলো 'ঈশ্বর আছে'---এই নিয়ে বসে আছে, আর কমিউনিষ্টরা 'ঈশ্বর নেই'—এই নিয়ে বসে আছে।—দুটোই ধারণার বশবর্তী। প্রত্যক্ষভাবে কেউ কাউকে প্রমাণে প্রমাণিত করতে পারছে না। যারা 'আছেন' বলে বসে আছে, তারা যদি একটা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান হয়, তবে যারা 'নাই' বলে ধরে আছে, তারাও একটা আর এক ধরণের ধর্মপ্রতিষ্ঠান হবে না কেন ? মেলামেশার দিক থেকে এখানে আপত্তি কোথায় ? তারা যে মিশতে চায় না, এটা কি করে আমি স্বীকার করব ? মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা উভয়ের মধ্যে সহজ-গতিতে থাকলে নিশ্চয়ই মিশবে। তারা ভাবছে—'নাই' বলে ভেবে নিলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়, 'আছে' বলে ভেবে নিলে কাজের অনেক অসুবিধা

বে। 'আছেন'-ওয়ালারা ভাবছে, "ওদের 'নাই'-এর কবলে পড়লে হকাল পরকাল দুই-ই যাবে।" উভয়ের দিক থেকেই ভাববার ়িষয় আছে। যাঁরা 'ঈশ্বর আছেন' বলে ভেবে যাচ্ছেন, াদের পাপ-পুণ্য থার্মোমিটারের মত উঠা-নামা করছে—এটা করলে াপ হবে, ওটা করলে পুণ্য হবে।—এ দুটোই মনগড়া এবং ধারণার শে। পাপ-পুণ্যের বিচার ঈশ্বরের কাছ থেকে সাথে সাথে পেলে নিয়ার সবাই মানতো; পূর্বজন্মের ভয় দেখিয়ে সেটা প্রমাণ হয় না। ়ড়িংএর ভিতর শলা ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে আর এক জন্মে অন্ধ য়েছে—ধর্মশাস্ত্রে এরকম দৃষ্টান্ত বহু আছে, কিন্তু সেটাতে প্রমাণ হয় । কসাইরা হরদম কেটে মাংস বিক্রী করছে, তাদের গতি নিশ্চয়ই ারলোকে—নরকে; আর মন্দিরে দেবতার সম্মুখে যে কসাই হরদম লি দিচ্ছে, তাতে তার কোন পাপ হচ্ছে না,—তার গতি ঈশ্বরলোকে —স্বর্গে। দুজনেই তো কসাই! দুজনের যে দুই গতি—এর ব্যাখ্যাকার ক? এখানকার লোকই তো! এখানে পাপ বলে যেটা মনে করছে, তাদের সে পাপ গঙ্গাস্নানে নষ্ট হয়, তীর্থে গেলে নষ্ট হয়। দান-ধ্যান বিধি-ব্যবস্থার ব্যবস্থাও আছে। মন্ত্রগুলোও সেরকম—'ভগবান! আমায় শুদ্ধ করে নাও, হে সূর্য! তোমার তেজে আমায় শুদ্ধ কর, হে জল াতাস! আমাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কর'—সবটাই যেন রামা, শ্যামাকে ডেকে কাজ করানোর মত। ক্ষণে বাতাস, ক্ষণে জল, ক্ষণে সূর্য, ক্ষণে ভগবান—সবাইকে ডেকে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয়। অত সমস্ত ঝঞ্ঝাটে গিয়ে পাপপুণ্যের উঠানামাতে যাওয়ার দরকার কি? মন্ত্রের অনুস্বার বিসর্গে, নানারকমের স্তোকবাক্যে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে অপবিত্রতার হাত থেকে পবিত্রতায় আনা যায়—এই তৃপ্তি মনগড়া বিধি-ব্যবস্থার তৃপ্তি। এখানকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যেসব মন্ত্র পাঠ করছেন তা' অতি সাধারণ—যাতে এখানকার অনুশোচনা অনুতাপের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে না হয়। তাই ক্লেদ, পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধিও আছে। 'ঈশ্বর আছেন'—এই চিন্তা করে

করে, তার বিধিব্যবস্থা মানতে মানতে হিমসিম খেয়ে যাওয়ার উপক্রম।

এক গাড়ী টাকা নিতে অসুবিধা, একটা চেক্ নিতে কোন অসুবিধা নেই!—মূল্য যখন একই, বোঝাই করে টেনে টেনে নিলে কি আমার মূল্যটা বেশী বাড়বে? তিন মাইল উপরে পাহাড় বেয়ে ক্লান্ত, গলদ্ঘর্ম্ম ও পরিশ্রান্ত হয়ে একটা প্রণাম ঠুকে এলাম, আর একজন পাহাড়ের পাদদেশে তিন মাইল উপরের উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করল, আর একজন 'ফ্যানে'র তলায় গদীতে বসে সেই উদ্দেশে প্রণাম করল—এখন কার কি হলো? মাপযন্ত্র থাকলে সেটা অনায়াসে বা'র করা যেত।—নাই যখন, ব্রতকথার মত মাহাত্ম্যকথা দিয়ে বিচার হয় না।

সবটাই দেখা যাচ্ছে একটা ধারণার বশে চালিত করা হচ্ছে। সেই ধারণার বশেই যারা 'ঈশ্বর নাই' এবং তাদের 'এই জীবনই শেষ' বলে ভেবে যাচ্ছে—তাদের তো কোন পাপ-পুণ্যের বালাই নেই। মানার ফলে অনেক বিপদ আছে। তাদের নিজেদের নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়,—কখন slip খেয়ে যায়, ফস্কে যায়। যারা মানে না—তাদের নীরস, কর্কশ, রুক্ষ বলে মনে হয়—কিন্তু সত্যিকারের আবেগ তাদের যথেষ্ট থাকে, আমি বিশ্বাস করি। যারা ঈশ্বর মানে—অক্লান্ত পরিশ্রম করে। যখন কোন সুরাহা হয় না, তখন তাদের বেশীরভাগ ব্যক্তি ভেক ধরা শুরু করে। এর পরিণতি হচ্ছে সম্প্রদায়। নিজেরাই তখন ভগবান হয়ে বসে এবং সমাজকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আজকের অধিকাংশ সাধু-গুরুদের মধ্যে কয়জন ভগবানের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—একটা এক্স্-রে যন্ত্র থাকলে দেখিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তারা এমন ভেক ধরেছে, যেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গেই কথাবার্তা বলছে,—'ঈশ্বর আছেন' এই sentiment এর সুযোগ নিয়ে সবাইকে আকর্ষণ করছে। তারপরই যার যার দল ভারী করবার চেষ্টা করছে, এবং দলগত বিবাদ তখনই শুরু হচ্ছে। যারা সত্যিকাবে 'ঈশ্বর আছেন'—এটা মেনে চলছে, তারা কিন্তু ভেক-এ

নেই। এরকম লক্ষে দু-চারটিও পাওয়া যাবে না। পরিশেষে বেশীর ভাগ বেশেই পরিণত হয়, আর তারই সুযোগ নেয়। যে সাধু-গুরু ভেক ধরেছে সে ভাবছে, 'আমার কিছু না হলেও ওর হয়েছে', আবার উনি ভাবছেন, 'আমার কিছু না হলেও তাঁর হয়েছে।'—এইরকমই চলছে। সঠিক প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি।—আজগুবি কথাতে সঠিক প্রমাণ হয় না।

আবার যারা সত্যিকারের ঈশ্বর মানে না তাদের সংখ্যাও বিরল। এদের মধ্যেও আছে—মানে না বলে ভিতরে ভিতরে মানে। তারাই এই দলে গোলমাল করে, মানে না বলে মুখে খুব আস্‌ফালন করে! দেখলে সকলে ভাববে—ঠিকই মানে না, কিন্তু বাস শনি-বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলে চোখ বুজে প্রণাম সেরে নেয়; হাত তুললে যদি কেউ দেখে। ঐ যে একটু চোখ বুজেছিল, তাও আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়, কেউ দেখলো কিনা। এই রকম দুমনা ব্যক্তি যে দলেই থাকে, সেই দলেই নানা ঝঞ্ঝাট-বিপদ ঘটায়। কিন্তু দুজনের দুটো দিক যদি সত্যিকারের ঠিক থাকে, তবে উত্তর মুখে একজনের গতি আর দক্ষিণ মুখে আর একজনের গতি হলেও হাঁটা-পথে দু'জন একদিন মিলবেই। দুজনের বিপরীত পথ ও মত, কিন্তু মিলন এক। তাই সত্যিকারের যদি তাদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, তবে যে কোন ব্যক্তির সাথে মিলতে তাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু উভয়ের দলের মধ্যেই যদি 'দোমনা' থাকে, তবেই যত গরমিল। নিষেধাজ্ঞা গড়ার মুখে খারাপ নয়। গাছ যে-পর্যন্ত ছাগ বা গরুর মুখের নাগালের মধ্যে থাকে, সে-পর্যন্ত বেড়া দেওয়াটা খারাপ নয়।

কাজের প্রতি, নীতির প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, তবে যে যে দলেরই হোক, পরস্পর মিলতে অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন ঃ—কমিউনিষ্টরা তো তাদের সাম্যবাদকে কেবলমাত্র রাজনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। বেদকে সেই রকম রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কি?

উত্তর ঃ—আগেই তো বললাম, ধর্ম বলতে এখন সাধারণ লোকেরা যা বুঝছে, সেটা প্রকৃত ধর্ম নয়—সেটা হচ্ছে ধর্মব্যবসায়ীদের মনগড়া অর্থ,

তা সম্পূর্ণ বেদবিরোধী। বেদের যে কর্মকাণ্ড, তা সম্পূর্ণ বস্তুবাদের উ
প্রতিষ্ঠিত। বেদের যে ধর্মনীতি তার সঙ্গে রাজনীতির কোন বি
নেই। জ্ঞান বৃদ্ধি ও সমাজ-উন্নতির জন্য যে যে পদ্ধতির প্রয়ো
বেদের কর্মপদ্ধতিতে সেই কথাই বলা হয়েছে। সেটাকে যে নীি
ফেললে তার সত্যিকারের অর্থ হবে—সেটাই হলো তার নীতি। ত
রাজনীতি বল—রাজনীতি, ধর্মনীতি বল—ধর্মনীতি। কোন বি
নাম দিয়ে তাকে ছোট করা যায় না। বেদের স্থি
হলো সত্য থেকে। সুতরাং তার নীতির মারামারি
আর নামানামিতে সত্যকে ভুল বুঝলে তো চ
না। সত্য যা, তা সত্যই। কমিউনিষ্টরা তা
সাম্যবাদকেও বিকৃতি থেকে মুক্ত রেখে সত্যের উপ
প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। সেই সত্যকে ধর্ম না বলে
রাজনীতি বল, তবে বেদের সত্যকেও রাজনী
নাম দেওয়া চলে। নামে কি আসে যায়?

বেদ কোন বিশেষ নীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বেদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বেদের ধর্মনীতি রাজনীতির বিরোধী নয়।

প্রশ্ন :—বেদের এই দৃষ্টিভঙ্গির তবে পরিবর্তন হলো কি করে?

উত্তর :—যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে
মধ্যেই তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। লোভে পাপ, প
মৃত্যু—এটা বেদেরই কথা। এই লোভই মানুষকে পাপের পথে ি
গেছে, পাপই সমাজকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়েছে। বেদের সাম্যবা
উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকায় তখন কোথাও অভাব ছিল না, অশ
ছিল না, সমস্যা ছিল না। আধিপত্যের লো
প্রথম তাদের পাপের পথে নিয়ে গেল। বে
আমল থেকেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোক ি
তাদের বলা হতো 'পণি'। তারা তাদের পণ্য ি
ব্যবসা-বাণিজ্য করত।—যে অর্থ তারা উপার্জন ক
তার সবটা তাদের প্রয়োজনে আসত না। কিন্তু ত
তাদের উদ্বৃত্ত ধন সমাজকল্যাণে ব্যয় না করে সঞ্চয় করে রাখত।

আধিপত্যের লোভ এবং ব্যবসায়ী বুদ্ধি মানুষকে বেদের সৎ চিন্তা, সৎ নীতি থেকে চ্যুত করেছে।

বণ্টন নীতি তারা মানত না। এদের থেকেই সৃষ্টি হলো পুঁজিবাদী। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা রকম ছল, মিথ্যা ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বেদের কথার অন্যরকম অর্থ করে সমাজকে বিভ্রান্ত করে তুললো।

আর এক শ্রেণীর লোক ঋষিবাক্য ও তাঁদের চিন্তাধারাকে ইচ্ছামত রংচং দিয়ে, মনগড়া অর্থ করে লোক ভুলিয়ে ব্যবসা শুরু করল। এর মূলেও সেই আধিপত্যের লোভ। আজও আমাদের রাজনীতি, ধর্মনীতি কর্তৃত্বদোষে দুষ্ট। আধিপত্যের লোভ আজও এখানে রয়ে গেছে, এবং ক্রমশঃই একে বিকৃত করে তুলছে। কর্তৃত্বের লোভ, ব্যবসায়ী বুদ্ধিই মানুষকে সৎ চিন্তা, সৎ নীতি থেকে চ্যুত করে দিচ্ছে। তারই ফলে ক্রমশঃ বেদের সেই উদার নীতি সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে আজ তা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তার মূল অর্থ ভুলে গিয়ে তাকে আজ আফিং-এর মত পরিত্যাজ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সেই মিছিলের 'পতিতে তারিতে হবে তারিণী'-র মুখে মুখে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে 'পঁচিশে তারিখে হবে বারুণী'-র মত মূল কথা আজ এমনই বিকৃত হয়েছে যে, তাকে 'আফিং' বলাটা কিছু অযৌক্তিক হয়নি। তারা যা শুনছে, দেখছে—তাই তারা বলছে।

এইভাবে স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে বেদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তার সাম্যবাদ, তার সত্যনীতি, তার বস্তুবাদ সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বস্তুবাদের উপর বেদ প্রতিষ্ঠিত। বস্তু বিনা বেদ অন্যদিকে তাকায় নি। সেখানে যে দেব-দেবীর কথা আছে, সেগুলি প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ—আলো, বাতাস, ঝড়, জল, মেঘ, বিদ্যুৎ, মাটি, নদী, সাগর, আকাশ, কাল ইত্যাদি। প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপকেই বেদে এক একটি নামে অভিহিত করা হয়েছে—যেমন সূর্যদেব, অগ্নিদেব, মরুৎ, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি। এদের থেকে আমরা উপকার পাচ্ছি—নিত্য প্রয়োজনে লাগছে;

বেদে যে দেবদেবীর কথা আছে সেগুলি প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

অতএব এদের স্মরণ কর—সেবা কর—পূজা কর। আবার স্মরণের জন্য, বন্দনার জন্য মুনিঋষিরা স্তবগান রচনা করলেন। কেউ কেউ আবার তাদের মনের ভাবকে মূর্তির মধ্যে রূপ দিল। সেই সব বন্দনার গানের শ্লোক যেমন সুন্দর—মূর্তিগুলোও অপূর্ব সুন্দর। সেই সব অপূর্ব মূর্তি দেখে শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তারা ঘরে ঘরে এই সব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শিল্পীদের রক্ষা করতে লাগল। তারা গুণের পূজারী ছিল। একটা ব্যাঙের মূর্তিও যদি কেউ সুন্দর করে গড়তে পারত, তবে সেটাকেই তারা মহৎ শিল্প বলে সেবা করত। শিল্পীকে রক্ষা করার জন্যই তারা শিল্পকে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করত এবং সেই প্রতিষ্ঠা দিবসে উৎসব, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি করত। কালক্রমে শিল্পের সেটাই মূর্তিপূজায় পরিণত হল। আলাদা করে মূর্তিপূজা বলে সে যুগে কিছু ছিল না। স্বর্গবাসের চিন্তাও তারা কিছু করত না। অন্যের সেবা করে নিজে তৃপ্ত হওয়া—এই চিন্তাই সকলের মধ্যে ছিল। অন্যকে তৃপ্তি দিয়ে নিজে যে আনন্দ উপভোগ করছে—সেটাকেই তারা মুক্তাবস্থা বলে মনে করতো। এই মুক্ত বা তৃপ্ত অবস্থায় আসতে হলে পরার্থে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে হবে। তবেই স্বর্গসুখ পাওয়া যাবে। এই মুক্তাবস্থায় আসার জন্য কে কিভাবে নিজেকে সমাজ-সেবায় উৎসর্গ করবে তারই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হ'তো। এই প্রতিযোগিতা হিংসামূলক নয়, দাবীমূলক। তাই সমবণ্টনে কখনও কোথাও কার্পণ্য হয় নি। এইগুলিই ক্রমশঃ স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে বিকৃত হয়ে 'মূর্তিপূজা', 'স্বর্গবাস' ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। একদল স্বার্থান্বেষী দেখল—এ তো বড় সুবিধা! তাদের মনে শয়তানি উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল। কর্তৃত্ব ও সকলের উপর আধিপত্য করার লোভে তারা প্রচার করতে লাগল—স্বপ্ন দেখেছে মূর্তি কথা বলছে—অমুকভাবে পূজা না করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না। এইভাবে সব কিছুর অন্যরকম অর্থ করতে করতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মূল জিনিসটা যে কি ছিল, তা আর বোঝার উপায় নেই। সেটা বুঝতে পারে না বলেই

ধর্মের নামে আজ সকলের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ ধর্মকে ভয় পাচ্ছে, কেউ উপেক্ষা করছে, কেউ ঘৃণা করছে. কেউ আবার তাকে opium-এর সঙ্গে তুলনা করে তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। আবার একালের স্বার্থান্বেষীরা এসব কিছু বুঝেও মানুষের দুর্বলতার, সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে সকলের মাথায় হাত বুলিয়ে চলছে। তারই জন্য আজ এই পরিবর্তন।

প্রশ্ন ঃ—সেই বেদের সাম্যবাদ কি করে আসবে ?

উত্তর ঃ—সবার ভিতর এই সাম্যবাদ আছে। পাঁচটি ছেলেকে পিতামাতা সব কিছু সমবণ্টন করেই দেয়। পাঁচজনও যা, পাঁচ কোটিও তাই, শুধু সীমার বাঁধন পার হয়ে যাওয়া। একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে একটা উনানও ধরানো যায়, আবার সেটা দিয়েই লক্ষ লক্ষ উনানও ধরানো যায়। আমাদের মধ্যে সেই রকম সব কিছুই আছে, শুধু সংস্কারের গণ্ডীতে সেগুলো আটকে আছে। সেগুলোকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংস্কারের গণ্ডী ভাঙ্গলেই বেদের সাম্যবাদ আপনা থেকেই স্ফুরিত হবে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি তো বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। এতে তো কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার কথা। সেই মতবিরোধ থেকে সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে। সে বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

উত্তর ঃ—বেদে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এখানকার কমিউনিজ্‌মের প্রয়োজনের দিক থেকে বিরোধ নেই। ওরা শুধু বলতে চায়, যে-ধর্ম সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছে সে ধর্ম আমরা মানি না। আমাদের বেদও তো কল্পনার ধর্মের কথা বিশ্বাস করতে বলে না! বস্তুবাদই বেদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এখানে বলা হয়েছে—বস্তুর পর বস্তু বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাও, তবেই পাবে চরম সেই বস্তু—যা সমস্ত কিছুকে ধারণ করে আছে। সেই চরম বস্তুই ধর্ম। এটা কল্পনার কথা নয়, বিজ্ঞানের কথা। বেদের ধর্ম বাস্তবের ধর্ম। সেখানে আছে সমাজ উন্নয়ন

বস্তুবাদই বেদের প্রধান অঙ্গ।

পরিকল্পনা, অর্থনীতির কাঠামো, রাজনীতির আলোচনা আর সব কিছুর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। আমাদের দেশে যাঁরা ধর্মের শীর্ষস্থানে বসে আছেন, তাঁদেরই উচিত ছিল ধর্মের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করে তার বাস্তবতার দিকটা, তার ব্যবহারিক দিকটা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া। তা না করে তাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে এর ব্যাখ্যা করায় ধর্মের প্রকৃত অর্থ আজ বিকৃত হয়ে গেছে এবং সেই ভেজাল-মিশ্রিত ধর্মই আজ দেশে প্রচলিত হয়ে গেছে। তারই ফলে এখানকার সাম্যবাদীরা আজ একথা বলতে পারছে। এ ছাড়া বৈদিক ধর্মের প্রকৃত অর্থের সঙ্গে তাদের নীতির কোন দিক থেকেই আমি কোন অমিল খুঁজে পাই না। একই বিষয়ের ভিন্ন নাম—বারি, water, পানি। অর্থ জানা থাকলে নামের তারতম্যে বিরোধ বাধারও কথা নয়, সংঘর্ষের সৃষ্টি হওয়াও উচিত নয়। অর্থের বিকৃতিতেই যত বিবাদ। সংঘর্ষ যদি বাধে, তবে বুঝের ভুলেই বাধবে। নতুবা নয়। হাজার হাজার বছর আগেকার পুরাণো বেদে ধর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছে, সেকথা সকলকে ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে পারলেই এ সংঘর্ষ কখনই বাধবে না।

মার্ক্সবাদের যা কিছু—তা যদি বেদের মধ্যে পাই, সে যে নামেই হোক, আর বেদের সাম্যবাদের সুর যদি মার্ক্সবাদে শুনতে পাওয়া যায়, তবে দুদিক থেকে এক হয়ে হাত মিলিয়ে কাজ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। প্রেম ভালবাসা যখন সব জাতির সব দেশের মধ্যে এক সুরেই বাঁধা আছে—তখন সব জাতি বা দেশের মধ্যে হাত মেলাতে অসুবিধা হবে কেন? সেই ভালবাসার সূত্র ধরেই মিলন বা যোগাযোগ সম্ভব। সুতরাং যারা সাম্যবাদী, তারা যে কালেরই হোক, যে দেশেরই হোক, যে জাতিরই হোক, তাদের মধ্যে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায়। কিন্তু দেশবাসীর মন এখনও সংস্কারাচ্ছন্ন। তাই ভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন তারা এখনও আশা করতে পারে না। এমন কি, তাদের মধ্যে যে এক সুর থাকতে পারে, সে কথা চিন্তাও করতে পারে না। তাই যদি বলি—মার্ক্সবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তবে আমাদের দেশের সবাই তাকে সমানভাবে গ্রহণ

করতে পারে না। আবার রাশিয়া বা চীনকে আমাদের দেশের বেদের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা যদি বলি, তারা সেটাকে প্রথমে আমলই দিতে চাইবে না, ধর্মের বিষয় বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। তাদের দেশে বেদ যেমন একটা কল্পনার বস্তু, আমাদের দেশে তেমনি মার্ক্সবাদ একটা আতঙ্কের বিষয়। অথচ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে, দু'এর অর্থ এক, বুঝের ভুলে আলাদা হয়ে গেছে। তাই আমাদের দেশে মার্ক্সবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বেদের মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; ওদের দেশে বেদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মার্ক্সবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কার্লমার্ক্সও সেটাই করেছিলেন। কার্ল-মার্ক্স রাশিয়ারও নয়, চীনেরও নয়, ভারতেরও নয়। অথচ তার ভাবধারা এ তিন দেশেই ব্যাপকভাবে প্রচারিত। আমি শুনেছি—চার পাঁচশত বছর আগে থেকে ম্যাক্সমুলার পর্যন্ত এবং তার পরেও অনেক জার্মাণ মনীষীরা ভারতীয় বেদ ও দর্শনশাস্ত্র তাঁদের দেশে নিয়ে গেছেন এবং তখন থেকেই জার্মাণী ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। বেদ ভারতেই রচিত ; কিন্তু বেদের চর্চা ভারতবর্ষে যেমন, জার্মাণীতে তেমনি হয়েছে এবং হচ্ছেও। কার্লমার্ক্স সেই জার্মাণ দেশেরই। সুতরাং এই শাস্ত্র তাঁর অজানা নয়। অতএব আমি যদি বলি—তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শন ও সাম্যবাদ অতুলনীয়, এবং এটাও যদি বলি যে, তিনি এটাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বুঝে তা প্রচারের জন্য দেশে দেশে যাত্রা করেছিলেন, তা হলে কি খুব ভুল হবে? তিনি এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে বেরিয়েছিলেন, তার জন্যই তাঁকে ঋষি বলা হয়েছে। পৃথিবীতে বিগত পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে যাঁরা এসেছেন, ইচ্ছা থাকলেও কেউ তাকে এরকম ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি।

ভারতে মার্ক্সবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে বেদের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

কার্লমার্ক্স নতুন কোন ism দেননি — বৈদিক যুগের ভারতীয় দর্শন ও সাম্য-বাদকেই তিনি পুনঃসম্প্রচার করেছেন মাত্র।

সত্যিকারের সাম্যবাদ যদি কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে যার যার সংস্কারকে হাতে নিয়েই প্রথমে কাজে নামতে হবে। সফলতা এলে সংস্কারকে সরিয়ে ফেলতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু প্রথমেই সংস্কারে আঘাত দিলে কেউই আর এগিয়ে আসবে না। কাজ আরম্ভ করতেই বহু বছর লেগে যাবে, সফলতা তো দূরের কথা। পেটভরা নিয়ে কথা—চামচ দিয়েই খাই, কাঠি দিয়েই খাই, আর হাত দিয়েই খাই—উদ্দেশ্য এক। আমি চাই দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু সাম্যবাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অবিচার, অত্যাচার, কারও নিন্দা বা অপপ্রচার, কিম্বা দেশে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করা অন্যায়। সাম্যবাদের নামে যা খুসী করলে সেটা শোভনীয় হবে না।

সাম্যবাদ সুন্দর, কিন্তু তার নাম ভাঙ্গিয়ে অবিচার, অত্যাচার, নিন্দা, অপপ্রচার, উচ্ছৃঙ্খলতা শোভন নয়।

এখানকার কমিউনিষ্টরা সাম্যবাদের ডিঙ্গিতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের নাড়ীর গতি বুঝে তা চালাতে পারছে না বা চাচ্ছে না বলেই তাতে সকলে উঠতে দ্বিধা বোধ করছে। ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ; সেখানে এসেই যদি স্লোগান দেওয়া হয়—ধর্ম মানি না, ভগবান বিশ্বাস করি না—তবে প্রথম থেকেই তারা দরজা বন্ধ করে দেবে। তাই বলছি, নাড়ীর গতি বুঝে কাজ কর। নাড়ীতে হাত রাখ, বোঝ তার গতির স্পন্দন, তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা কর। তবে তো উদ্দেশ্য সফল হবে! কথা নেই বার্তা নেই, অসুখ করেছে বলেই ফস করে পেনিসিলিন ইনজেকসন্ দিয়ে দিলেও হবে না! রুগীর **constitution**-এ পেনিসিলিন সহ্য হবে কিনা, সেটা তো আগে জেনে নিতে হবে! তা না হলে **reaction** হবেই। একটা ব্যক্তি-দেহের **reaction**, আর একটা সমাজ-দেহের **reaction**—কথা একই। যেখানে ভক্তি-ভালবাসা দিয়ে কাজ উদ্ধার করা যায়, সেখানে সেভাবেই কাজ করতে হবে। আবার যেখানে লাঠি-শোটার

লাঠির জায়গায় লাঠি, বুঝের জায়গায় বুঝ। নাড়ীর গতি বুঝেই ওষুধের বিধান দিতে হবে—তবেই সফলতা আসবে।

প্রয়োজন, সেখানে সেগুলি নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বুঝ্-এর জায়গায় লাঠি নিলেই যত গণ্ডগোল।

প্রশ্ন ঃ—আজকের বাংলা বা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলি যতই সাম্যবাদ সাম্যবাদ করে চেঁচাক, আমার তো মনে হয় প্রকৃত সাম্যবাদের সুর কারুর মধ্যেই নেই ; তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য গদী দখল করা। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, দেশ বা দেশবাসী সম্বন্ধে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আপনি কি মনে করেন ?

উত্তর ঃ—উঁইয়ের পাখা গজায় আগুনে পুড়ে মরার জন্য। সুতরাং ভাববার কি আছে ? নিজেদের মধ্যে আগুন যখন লেগেছে, তখন সে আগুনে পুড়ে সব একাকার হয়ে যাবে। তখন আর আলাদা খণ্ড খণ্ড দল থাকবে না। সব দল সাম্যবাদের নীতির ঢাকনিতে ঢেকে এক নব সংগঠন গড়ে উঠবে। তাদের নীতি হবে বেদভিত্তিক সাম্যবাদ। আজকের দিনে বাঁচতে হলে এই ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদই একমাত্র পথ। হাজার হাজার বছরের পুরাণো সাম্যবাদ আবার আমাদের দেশে ফিরে আসবে বলেই যেন আজ অতশত পার্টি গজিয়ে উঠ্ছে আর তাদের মধ্যে অতশত গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে।

পার্টিতে পার্টিতে যখনই ভীষণ গোলযোগ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তখন গোলমালের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে, তখন পতন অবশ্যম্ভাবী। এবং সে পতন এমনই অকস্মাৎ যে, তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই জানতে পারে না। আজ যতই পার্টিতে পার্টিতে দলাদলি হোক, একদিন উত্তরবঙ্গের বন্যার মত সাম্যবাদের বান এসে পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সাম্যবাদের ডিঙ্গিতে যারা আছে, তারাই শুধু টিঁকে যেতে পারে। আমাদের ধমনীতে বহু হাজার বছর ধরে, সেই বেদের যুগ থেকে সাম্যবাদের রক্তধারা প্রবাহিত। আমরা এতদিন সেই রক্তের স্বাদ ভুলে ছিলাম— ভেড়ার দলে মিশে সিংহশাবক যেমন ভুলে থাকে তার রক্তের প্রকৃতি,

আর ক্ষুধার তাড়নায় ঘাস-পাতাই চিবোতে থাকে। রাশিয়া আর চীনের বিপ্লবের ধাক্কায় ভারতের সিংহ-শাবকেরা আজ জেগে উঠেছে। তারা রক্তের স্বাদ পেয়েছে—সাম্যবাদের স্বাদ বুঝেছে। আর বুঝেছে—এই সাম্যবাদের রক্তধারা তাদের সকলের শিরায় প্রশিরায় হাজার হাজার বছর আগে থেকে বইছে। তাদের সবার রক্ত এক—সবার অধিকার এক। এবার সামলান দায়। এবার ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। বৈদিক সাম্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হবে এক বিরাট বিপ্লব,—তাতে এসে যোগ দেবে রাশিয়া আর চীন।

বৈদিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে এক বিরাট বিপ্লব শুরু হবে এবং তাতে যোগ দেবে রাশিয়া আর চীন।

আমি মার্কস্‌বাদ বুঝি না, লেনিনবাদ বুঝি না, মাওবাদও বুঝি না। আমি শুধু বুঝি—যাদের মধ্যে কিছুটা সাম্যবাদের সুর আছে তারাও আমাদের সাথে আসতে দ্বিধা বোধ করবে না। তাই ব্যক্তিগতভাবে কোন পার্টি বা দল সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি রাজী নই। শুধু এইটুকু বলতে পারি—আজ হোক, কাল হোক, খণ্ড পার্টি আর থাকবে না। সাম্যবাদের বন্যায় সব ভেসে একাকার হয়ে যাবে।—একদলেই সবাই আসবে।

খণ্ড পার্টি, খণ্ড দল কিছু থাকবে না। সাম্যবাদের বন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে, একদলেই সবাই আসবে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি বলছেন—ভারতে এক দলেই সবাই আসবে। সেটা কোন্ দল ?

উত্তর ঃ—প্রকৃতি থেকে যেই নিয়মে যেই ধারাতে সৃষ্টি হয়ে আসছে—সেই নিয়মে কোন দুই নেই, আছে শুধু এক—সমসুরে সম মাত্রায় বাঁধা,—যাকে খুঁজলে হদিস পাওয়া যায় না, অথচ প্রতি বস্তুর অস্তিত্বের অনুসন্ধানে সেই অসীমের সাড়া পাওয়া যায়। এই মৃন্ময় পৃথিবীর জীবজগৎই হলো তার প্রমাণ। এক পৃথিবী, একই চন্দ্র-সূর্য আকাশ-বাতাসের মধ্যে সমস্ত জীবজগৎ নিয়মের harmony-তে সুন্দরভাবে এক সুরে বাঁধা। ছোট বড় নির্বিশেষে প্রতি

সাম্যবাদই প্রকৃতির মূল নিয়ম, মূল সুর; সাম্যবাদই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের প্রথম কথা, প্রধান কথা।

বস্তুই সুসজ্জিত—কেউ বাদ যায়নি। প্রতিটি বস্তুর উপর প্রকৃতির এই যে সুনজর—সমদৃষ্টি, প্রকৃতিজাত জীবের মধ্যে তবে কেন থাকবে না সেই সাম্যবাদের সুর? সেই সাম্যবাদই হবে জীবের একমাত্র অস্ত্র। সেই সাম্যবাদের টানে সব দল একদল হতে বাধ্য হবে। প্লাবনের টানে সব গর্ত এক হয়ে যায়। সাম্যবাদই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের প্রথম কথা, প্রধান কথা। সকল তীর্থে এক দেবচিন্তায় লক্ষ লক্ষ হাতের জল এক শিলাতেই পড়ছে। মঠে, মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় সবাই একভাবে গিয়ে প্রার্থনা করছে। সমান রাস্তা পেলে গাড়ী সহজ গতিতে চলে যায়, ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনা। আজকে জাতির মধ্যে ব্যতিক্রমেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এত দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা।

প্রশ্ন ঃ—এতগুলো রাজনৈতিক দল না হয়ে সবাই সাম্যবাদে এসে পড়লে সবই তো চুকে যায়। আসে না কেন?

উত্তর ঃ—সাম্যবাদের উপর কেউ নেই—একথা আমি বিশ্বাস করি না। সবাই বেদের সাম্যবাদ চাইবেই। দু'চক্ষে যে জিনিসটা দেখতে চাই, সেইটুকু দেখে আমরা শেষ করি না।—দেখার পথে অগণিত জিনিস চোখে পড়ে। কর্ণেও ঠিক তাই,—অগণিত শব্দ আসছে। এক সাগরে সবাই স্নান করছি। আমরা যা করছি, সবাইকে নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। তবুও ভুল করছি। খণ্ড খণ্ড যতগুলো দল আছে, একা দাঁড়িয়ে কেউ দল করছে না; সেই দলে একজনের অধিক আছেই। অধিকের মাত্রা আরো অধিক নিয়ে যদি করে, তবেই চুকে যায়। বাড়ার মুখে থেমে গেলেই হোঁচট খেতে হয়। আজ দলগুলি হোঁচট খেয়ে থমকে গেছে, তারা সেখানেই দাঁড়ি টেনে বসে গেছে। ওই দাঁড়ি না টেনে যদি ড্যাশ টেনে আরও এগিয়ে যেত, যে যেদিকেই এগিয়ে যাক না কেন, উত্তরমুখী, দক্ষিণমুখী—দুই বিপরীতমুখীই এক হয়ে যেত। আজ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত প্রভৃতি দিকে সমান মাত্রায় যাত্রা করলে এক রেখাতে দশ দিক,

আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে মারামারি দলাদলি, তা মিলিত হবার জন্যই।

দশ অবতারের একত্রে মিলন হতো। দল থাকাতে ত্রুটী নেই—সবার মুখ একদিকে হয়ে যাচ্ছে; থেমে গেলেই বিপদ। আজ এখানকার দলগুলো থেমে গেছে, তাই যত গোলমাল হ'চ্ছে। যাত্রিকরা যাত্রা করেছে—ভীড় অনেক; যখনই থেমে যাচ্ছে, পিছনের ধাক্কা খেয়ে খেয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। সামনের ভীড়ের চেয়ে পিছনের ভীড় এত সহস্রগুণ বেশী যে, পিছনের ভীড়ের ধাক্কায় সামনের ভীড়ের সবাইকে এগিয়ে নিচ্ছে, থেমে যাওয়ার উপায় নেই। আজ দলগুলো যেখানে যেখানে থেমে আছে—পিছনের ভীড়ের চাপ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, সেই ধাক্কাতে কারও থেমে থাকার উপায় নেই। ওই ধাক্কাতেই সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সাম্যবাদ প্রকৃতিগত—বৃষ্টির মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ব্যাধির উপদ্রব ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর উপযুক্ত ব্যবস্থা না হবে। আজ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে মারামারি দলাদলি—যতক্ষণ মিলনের সুরে না আসছে, ততক্ষণ এগুলো থাকবেই। মিলিত হওয়ার জন্যই ওইগুলো।

প্রশ্ন ঃ—বর্তমান দেশের যে সঙ্কটময় অবস্থা—কলকারখানা প্রায় সব বন্ধ, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, দিন দিন দেশে নিরাপত্তার অভাব ঘটছে—এগুলি কি শুভ হচ্ছে? এগুলির প্রতিকার কি?

উত্তর ঃ—আজ দেশের যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার একমাত্র মীমাংসা—সাম্যবাদকে ভিত্তি করে সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলা। ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর আগেও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থে। এই সাম্যবাদকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা চলেছিল, আজও আমাদের তন্ত্রে, মন্ত্রে, দেব-দেবীর মূর্তির পরিকল্পনার মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বেদের মধ্যে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয়েছে, সেই ভাবের যে আজ বিকৃতি ঘটেছে—সাম্যবাদের জাহাজ যে আজ থেমে গেছে, তা শুধু নিজেদের স্বার্থ ও দলাদলিরই ফলে। ভারতীয় সাম্যবাদ বা বেদভিত্তিক সাম্যবাদের মূল কথাই হ'ল 'এক জাতি, এক

নীতি,' 'এক ভাবে চল, এক ভাবে বল।' তাদের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তা বাস্তব বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিল। বস্তুভিত্তিক আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বেদে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেদ বলছে—ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয়। বস্তুর বিশ্লেষণের অন্বেষণে চলে যাও। তথ্যের গবেষণায় যখন ডুবে যাবে, তখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে এর মূল তত্ত্ব। তুমি অবগত হ'তে পারবে এ সব বস্তুর চেতন ও চৈতন্য সম্পর্কে। জানতে পারবে—এদের জীবন আছে কি নেই, বস্তুর অণুপরমাণুগুলো আমাদের জাগতিক প্রাণের আবেগের সঙ্গে সাড়া দেয় কিনা, আমাদের মানসিক জগতের অণুপরমাণুর উপর তা কতটা কার্যকরী হয়। প্রাণের আকুতি, মিনতি বা ডাক যথাস্থানে পৌঁছায় কিনা, সে বিষয়ে তোমার দ্বন্দ্ব তখনই ঘুচে যাবে যখন তুমি সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে পারবে।

ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয়। বেদ এই বস্তুভিত্তিক আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে।

এই বিশ্বজগৎ অণুপরমাণুরই খেলা। এই অণুপরমাণুর মধ্যেই আমাদের মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিয়ে ডুবুরীর মত তার তত্ত্ব খুঁজতে হবে। বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে জানার পথে জানতে জানতে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই বাস্তব সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। এই যাওয়াটাই হচ্ছে সাধনা। সাধনা শুধু ফোঁটা কাটা, তিলক কাটা, আচার অনুষ্ঠান নয়—সাধনা শুধু জপ তপ পূজা অর্চনাও নয়। একাগ্রতাই সাধনা। যে কোন বিষয়ের মধ্যে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করা বা মনন করাকেই সাধনা বলে। বেদ সেই সাধনার কথাই বলে।

সাধনা শুধু ফোঁটা-তিলক, আচার-অনুষ্ঠান, জপ-তপই নয়, যে কোন বিষয়ে একাগ্রতাই সাধনা।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা হয় একটা ভীতির বস্তু, না হয় একটা কল্পনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটোই ব্যাধি। আমাদের ধর্ম আজ ব্যাধিগ্রস্ত। আমাদের সমাজ আজ ব্যাধিগ্রস্ত। তার মূল কারণই হলো সেই শোষকশ্রেণী—যারা উপাধির আশ্রয় নিয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে,

বেদকে বিকৃত করেছে, উপাধির প্রলোভন ও লালসা দেখিয়ে নিজেদের সঞ্চয় বাড়িয়েছে, অন্যদের নিঃস্ব করেছে।

একশ্রেণীর লোক ধর্মের নামে জনগণের সহজ সরল মনের সুযোগ নিয়ে সমাজে একটা অঘটন ঘটাতে পারে, এ চিন্তাও তৎকালীন চিন্তাশীল মুনি-ঋষি ব্যক্তিদের মনে এসেছিল এবং বেদে সে সম্বন্ধেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বেদের অর্থ আজ অনেক বিকৃত হয়ে গেছে ; তবু তন্ত্র, মন্ত্র, দেব-দেবীর বিভিন্ন মূর্তির পরিকল্পনার মধ্য থেকে যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তার থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বেদে আছে সাম্যবাদভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা। বেদ যদি ভালভাবে চর্চা করা যায়, তবে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য যা-যা দরকার, তার সকল কিছুর কাঠামোই আমরা সেখান থেকে পেয়ে যাব। বেদের অতল সাগরতলে আছে সবই ; শুধু ডুবুরী হয়ে ডুবতে হবে, জহুরী হয়ে চিনতে হবে, তারপর কারিগর হয়ে গড়তে হবে। সেই হাজার হাজার বছর আগেকার ভারতীয় সাম্যবাদের মণি দিয়ে বর্তমান সমাজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে হবে। তবেই সকল সমস্যার সমাধান হতে পারবে।

সাম্যবাদভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা বেদেই আছে।

হাজার হাজার বছর আগে সাম্যের সাগরে যে ভারতীয় জাহাজ চলতে শুরু করেছিল, অবস্থা বিপর্যয়ে আজ তা থেমে গেছে। কিন্তু সেই সাগরের ঢেউয়ের তরঙ্গ চলে গেছে এদিকে সেদিকে ; তারপর বহুদূরের কোন তীরে ধাক্কা খেয়ে সেই জলস্রোতই ফিরে এসেছে এপারে। তারই দোলায় দুলছে ভারতবর্ষের থেমে যাওয়া জাহাজ। আমরা, যারা জলস্রোতের ফিরে আসাটাই শুধু দেখছি, তারা বলছি—রাশিয়া থেকে কিম্বা চীন থেকে কিম্বা অন্য কোন বিদেশ থেকে আসা সাম্যবাদের স্রোতে ভারতবর্ষ আন্দোলিত হচ্ছে। তা তো ঠিক নয়! সে তার নিজের তোলা তরঙ্গের দোলায়ই দুলছে। গতি তার রুদ্ধ হয়েছে, নষ্ট তো হয়নি!

এখনকার প্রচলিত যে সাম্যবাদ, হাজার হাজার বছর আগের ভারতীয় সাম্যবাদ তার মূল সূত্র। সেই বেদভিত্তিক সাম্যবাদই একদিন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

থেমে থাকা জাহাজকে তারই সাগরে আবার চালাও। জাহাজ চলতে শুরু করলে তারই গতির ঢেউ সর্ব জগতে ছড়িয়ে পড়বে। সকল দেশের, সকল জাতির সকল লোকই এসে সেই জাহাজে আশ্রয় নেবে। তবে স্রোতের গতি বুঝে জাহাজ চালাতে হবে। তবেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে কোন মুস্কিল হবে না, সময়ও লাগবে না।

হজরত মহম্মদ বুঝেছিলেন—জাতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে; আর দেশে সাম্যবাদকে আনতে হলে শুধু 'সাম্যবাদ সাম্যবাদ' বলে চিৎকার পাড়লেই চলবে না, ধর্মের মাধ্যমে তার ভিত দৃঢ় করতে হবে। তাই কোরাণের মাধ্যমে তিনি সাম্যবাদ প্রচার করলেন। আজ সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে এই সাম্যবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তারা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে কোরাণ হাতে একমাঠে এসে দাঁড়ায়। বেদের যে ভাবধারা, আমি হজরত মহম্মদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেই বেদের ধ্বনিই শুনতে পাই। আজানের সুর যখন কানে আসে তখন মনে হয়, এ তো অজানা নয়। রক্ত যখন সকলের লাল, সুরের তখন কি করে বৈষম্য হয়? হতে পারে না। সংস্কারবশে আলাদা করে ফেললেও নীতির দিক থেকে এক। 'আল্লা হো আকবর' কথাটার সুর আমাদের শাস্ত্রেও আছে। বেদ বলছে—আমরা সূর্যের উপাসক— জ্যোতির পূজারী। কারণ তেজ বা শক্তিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর ধারক, বাহক, পরিচালক। সুতরাং তাহাই শ্রেষ্ঠ। 'আল্লা হো আকবর' কথার অর্থও তাই। 'আল্লা' ও 'আলো' এ দুইটি কথা একটা মূল কথারই ধারা কিনা, তাই বা কে বলতে পারে? হতেও তো পারে, 'অর্কবর' (সূর্যদেব) আর 'আকবর' একটি শব্দ থেকেই এসেছে। খুঁজে দেখো। আমি তো বলি—সব কিছুরই উৎস এক। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের মুখে মুখে তার রূপ বদলে গেছে। সেই বদলে যাওয়া রূপটাকে নিয়েই আমরা বসে আছি। সে সংস্কারকে আর ছাড়তে পারছি না। মূল জিনিস যখন এক, তখন

কোরাণের মাধ্যমে হজরত মহম্মদ সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন।

ঠিকমত বোঝাতে পারলে, ঠিকমত দিতে পারলে সকলে গ্রহণ করবে না কেন ?

প্রশ্ন ঃ—ভারতে সাম্যবাদের চতুর্থ ধারাটি কি আপনার বেদভিত্তিক সাম্যবাদ ?

মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ—সকল ধারারই মূল উৎস বেদভিত্তিক সাম্যবাদ।

উত্তর ঃ—বেদভিত্তিক সাম্যবাদ ধারা হবে কেন ? ওটাই মূল উৎস—যেখান থেকে অন্যান্য ধারাগুলি বেরিয়েছে। ভারতবর্ষের বেদ—সে কি আজকের কথা ! এর যে কবে সৃষ্টি হয়েছে, সঠিক বলা সম্ভব নয়। শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম—এঁরা বেদের চর্চা করেছিলেন। কার্ল মার্ক্স তো এঁদের অনেক পরে। ৪।৫ হাজার বছর আগের কথা তো এখানেই পেয়ে যাচ্ছি ; বেদ তারও অনেক আগে। যারা এই বেদভিত্তিক সাম্যবাদে থাকবে, তারা সব ধারার মধ্যেই তাদের মতবাদকে খুঁজে পাবে। এর সঙ্গে মার্ক্সের কমিউনিজমের মিল পাবে, লেনিনের কমিউনিজমের মিল পাবে, মাও-সে-তুঙ্গ-এর কমিউনিজমেরও মিল পাবে। সুতরাং সকলেই যখন যার যার মতবাদকে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, তখন একে গ্রহণ না করার কি আছে ? শুধু বাংলা বা ভারতে নয়, পৃথিবীর কাছে আমি এই বেদভিত্তিক সাম্যবাদকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। যখন তারা সকলে এটা পাবে, তখন বুঝবে—বেদের সাম্যবাদ কত ব্যাপক। কত উদার এর দৃষ্টিভঙ্গি, কত বাস্তব এর চিন্তাধারা।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তাই যে মতবাদ ধর্মকে বর্জন করতে চায়, তাদের কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

সাম্যবাদের প্রকৃত সুর এখনও কোন ধারার মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। ভারতবাসী তাই কোন ধারাকেই আজ সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারছে না। ভারতবাসী ধর্মবিশ্বাসী। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ও ধর্মভিত্তিক। যে মতবাদ ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে চাচ্ছে, তার অন্যান্য দিক গ্রহণীয় হলেও, তাকে তারা সম্পূর্ণ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না।

যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম। বেদ সেই কথাই বলে। বেদের ধর্ম বলতে যা বোঝাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ জ্ঞান ও কর্মভিত্তিক। জ্ঞান হচ্ছে সত্য, জ্ঞান হচ্ছে মুক্তি, জ্ঞান হচ্ছে বিচার, জ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধি। সুতরাং এই সবের উপর ভিত্তি করেই বেদের ধর্ম। বেদের যুগে সকলে চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনার দ্বারা চালিত হ'তো। তাই সমাজের প্রয়োজনগুলি অতি সহজেই মিটে যেতো। বেদের ধর্মের আর একটি ধারা হচ্ছে কর্ম। কর্তব্যের উপর তখন সকলের এত বেশী নজর ছিল যে, সেই কর্তব্যকে কেউ এড়াতে পারত না; তাই তখন অভাববোধটা খুব বেশী ছিল না। যতটুকু ছিল, সেটাও সহজেই সমাধান হতো। বেদে ধর্ম কি, কর্ম কি, সৃষ্টির মূল রহস্য কি, এসবের সুন্দর সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা আছে। সেই সমস্ত তত্ত্ব যদি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে সকলেই বুঝবে—মার্ক্সিজ্‌মের সঙ্গে এর মিল কোথায়, পার্থক্যই বা কোথায়? মূল ও প্রকৃত জিনিস পেলে সকলেরই চিন্তাধারার প্রসার হবে। ভারতবাসীরও আর কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হবে না, কমিউনিষ্ট তথা সমগ্র পৃথিবীবাসীরও বেদভিত্তিক সাম্যবাদ গ্রহণে আপত্তি থাকবে না। আমি সেই চেষ্টাই করছি।

প্রশ্ন ঃ—আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজনীতিতে ও এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কতটুকু দেওয়ার আছে?

উত্তর ঃ—এখানে গোড়াতেই একটা ভুল অনেকেই করে থাকেন —আধ্যাত্মিক বা ধর্ম-বিষয়কে এখানকার সবকিছু থেকে আলাদা করে ভাবেন। রক্ত মাংস মজ্জা নিয়ে যে দেহ, সেই দেহগত আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম সেই দেহকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আবার এই দেহ পঞ্চভূতেই তৈরী—যেমন জল, বাতাস, মাটি, তাপ ইত্যাদি; সুতরাং তাদের বাদ দিয়েও চলবে না। আগেও বলেছি, আধ্যাত্মিক বলে যা কিছু—আধিভৌতিক থেকেই। সেই আধিভৌতিকের আদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর বস্তুত্বকে অনুসন্ধান করে সন্ধান পাওয়াই আধ্যাত্মিকের

আধিভৌতিক দেহগত যে আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম তা বাস্তব ছাড়া নয়। তাই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা রাজনীতি-সমাজনীতির বাইরে নয়।

একটি কাজ। সব কিছুই এই বাস্তবের বিষয়বস্তু দিয়েই—যে যে-বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে যা করছেন সেটাই সাধনা, তা আধ্যাত্মিকের ছোঁয়াচছাড়া নয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিদের এখানকার সব কাজে হস্তক্ষেপ করে যাতে স্রোতের জল আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করা সমীচীন। নালা-গহ্বরে জল জমে যাওয়ার ফলেই আজ এই অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—সেই জল যাতে সাগরের স্পর্শে আসতে পারে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের তাই করা সমীচীন।

প্রশ্ন :—প্রকৃত রাজনীতির স্বরূপ কি ?

উত্তর :—সকল নীতির সেরা নীতি হচ্ছে রাজনীতি। কিন্তু আজকাল রাজনীতির নামে যা হচ্ছে সেটা তো 'সাজ-নীতি'। আজকালকার ধারণা, একটা 'পার্টির পোষাক' গায়ে না চড়ালে রাজনীতি করা যায় না। অর্থাৎ রাজনীতি করতে হলেই আগে একটা দল চাই। রাজনীতি করতে হলে আলাদা পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হয় নাকি ? তুমি কি পার্টিতে নাম লিখিয়ে বিশেষভাবে দেখাতে চাও—তুমি রাজনীতিতেই আছ ? প্রকৃত রাজনীতির ক্ষেত্র একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এর ক্ষেত্র অনেক বিরাট, অনেক ব্যাপক। সে ক্ষেত্রে সকলেই আছে—কেউ ফ্রণ্টে থেকে কাজ করছে, কেউ পেছনে থেকে কাজ করছে। যে যা করছে, তাইই রাজনীতি। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ বল, শিক্ষামূলক কাজ বল, সাংস্কৃতিক কাজ বল, এ সব কিছুই একটা কাজেরই বিভিন্ন দিক। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি—এর কোনটাকেই আমরা একেবারে 'এয়ার-টাইট কম্পার্টমেণ্টের' মত সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিতে পারি না, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সংযোগ আছে। সুতরাং যে যে-ক্ষেত্রেই কাজ করে যাক, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ ভাবে রাজনীতিতেই সহায়তা করছে। আবার রাজনীতির ক্ষেত্র আর পারিবারিক ক্ষেত্র আলাদা কিছু নয়। প্রথমটা দ্বিতীয়রই একটা এনলার্জড্ এডিশন (বৃহত্তর সংস্করণ)। পরিবারের বিভিন্ন সভ্যদের সঙ্গে যেভাবে

রাজনীতির ক্ষেত্র আর পারিবারিক ক্ষেত্র আলাদা কিছু নয়—প্রথমটা দ্বিতীয়রই একটা এন্‌লার্জড্ এডিশন।

চলতে হয়, যেভাবে আচার আচরণ করতে হয়, রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সেইভাবেই চলতে হয়, সমাজের সকল সভ্যের সঙ্গে সেইভাবেই মিশতে হয়।—এটাই বেদের কথা। এটাই আমি জানি। কিন্তু আজকালকার রাজনীতি ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি ছাড়া আর কিছু নয়।

দলভারি করার জন্য অনেক পার্টিই ভাল ভাল কথা জনগণকে বলে বেড়ায়, কাজের সময় তা করে না। আর যেটুকু করে, খোঁজ নিয়ে দেখ, পার্টির লোকেদের জন্যই করে। পার্টি থেকে কতটুকু সার্ভিস (কাজ) জনগণ পাচ্ছে? তাতে তাদের কতটুকু সুযোগ-সুবিধা হচ্ছে বল? তাই আমার মনে হয়, পার্টির মধ্যে থেকে নিজের চিন্তাধারাকে সঙ্কীর্ণ না করে, স্বাধীনভাবে সমাজ-সেবায়, দেশের কাজে, জনগণের হিতার্থে যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে পার, তবে সেটাই হবে বড় রাজনীতি। আজকের দিনে এইভাবে কেউ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছে না বলেই চারিদিকে একটা আগুন জ্বলার পূর্বাবস্থা দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক পার্টিই জনগণকে শান্তির বাণী শোনাচ্ছে, বারি সিঞ্চন করতে পারছে না। শুকনো কথার ঘর্ষণে শান্তিবর্ষণ হয় না, দাবানলই জ্বলে ওঠে। ভাল ভাল কথা শুনে অভিনন্দন জানাতে জানাতে তো গলা শুকিয়ে গেল, হাততালি দিতে দিতে তো হাতে কড় পড়ে গেল! লাভটা হলো কি? ভিটাতে যে আজ শকুন বসে আছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

পার্টির মধ্যে থেকে নিজের চিন্তাধারাকে সঙ্কীর্ণ না করে স্বাধীনভাবে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারলে সেটাই হবে বড় রাজনীতি।

রাজনীতির উদ্দেশ্য থাকবে দেশের শান্তি, দশের শান্তি। যত দল যত পথ থাকুক না কেন, উদ্দেশ্য হবে এক। আর উদ্দেশ্য যখন এক, তখন মতভেদ আসবে কেন? বিবাদ হবে কেন? কিন্তু তাই হচ্ছে। তার কারণ, আজ যে-শান্তির কথা বলা হচ্ছে, সে শান্তি সবাইকে নিয়ে নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শান্তি কামনাই আজকের বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি একচ্ছত্র আধিপত্য করছে আর কয়েকজনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। একে কি রাজনীতি বলে?

যদি রাজনীতি করতে চাও, তবে আগে নিজের মনকে ব্যাপক কর। সবাইকে আপন মনে করে এক আসনে আনতে চেষ্টা কর। বিশ্ববোধ যতক্ষণ পর্যন্ত না জাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতি করার অধিকার জন্মে না। এরকম মন ও ইচ্ছা কোন কোন পার্টিতে যে একেবারে নেই, তা নয়। তাদের নীতিতে ও আদর্শে আছে, কিন্তু কার্যে ততটা নেই। চিন্তায় ভাবনায় আছে, আচার-আচরণে তেমন পাওয়া যায় না। কি লাভ বল এতে? আজকাল অনেক ক্ষেত্রে শোষক ও পুঁজিবাদীদের প্রভাবে পার্টিকে নড়াচড়া করতে হচ্ছে। যেহেতু পার্টির মেম্বার, সেইহেতু তাকে পার্টির ডিসিসন মেনে নিতেই হবে; সেইজন্য মেম্বারদের অনেক সময় ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ক্রমশঃ আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে পড়ছে, সত্যিকারের মন থেকে সরে পড়ছে।

বিশ্ববোধ যতক্ষণ পর্যন্ত না জাগবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতি করার অধিকার জন্মে না।

এই যে আজকাল অনেক সময় পুঁজিবাদীদের নির্দেশে পার্টিকে নড়াচড়া করতে হচ্ছে, তার জন্য অবশ্য আমি সবসময় পার্টিকে দোষ দিই না। কারণ শোষক ও পুঁজিবাদীদের প্রভাব আজ সমাজে এত বেশী যে, এ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। অবশ্য কেউই যে এ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তা নয়। যারা তা পারছে, তারাই রাজনীতি করার যোগ্য।

প্রশ্ন ঃ—আচ্ছা, পুঁজিবাদীদের প্রভাবে অনেক সময় পার্টিকে নড়াচড়া করতে হয়—একথা আপনি কেন বললেন?

উত্তর ঃ—পার্টি চালাতে হলেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ আসবে কোথা থেকে? হয় ভিক্ষা করতে হবে (ভিক্ষা আজকাল কেউ দিতে চায় না, কারণ প্রত্যেকেরই নিজের অভাব পূরণ হচ্ছে না), তা না হলে ডাকাতি করতে হবে। তখন আইনের ভয় আছে। এছাড়া আর একটি

পথ আছে—পুঁজিবাদীদের মন জুগিয়ে চলা। সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। হয়তো কেউ সেই সহজ পথের দিকে ঝুঁকলো, অন্যেরা এপথ সহজ হলেও আদর্শবিরোধী বলে বাধা দিতে চাইল।—বেধে গেল পার্টির ভেতরে গণ্ডগোল।—আবার অনেক সময় পার্টি হয়তো নিজেদের মধ্যে মিটিং করে ঠিক করে নিল—এই পুঁজিবাদীদের থেকেই টাকা নেওয়া উচিত; সে টাকা নিয়ে সমাজসেবায় লাগালে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। এই সিদ্ধান্ত করে তারা পুঁজিবাদীদের থেকেই অর্থ সংগ্রহ করল। একথা জানতে পেরে 'পুঁজিবাদীদের দালাল' বলে অন্য পার্টি আবার লাগল তাদের পেছনে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনীতির ডামাডোল। নিরীহ জনগণকেই তার ফল ভোগ করতে হয়।

সমাজকে দূষিত করার মূলেই এই শোষকশ্রেণী। এরা সমাজের পরগাছা। সমাজকে শোষণ করার ক্ষমতা এদের প্রবল। সুতরাং প্রকৃত রাজনীতি যদি করতে চাও, শোষণ ও পুঁজিবাদকে বিনাশ কর। বেদও সেই নির্দেশই দিয়েছে—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।' দুষ্কৃতিকে বিনাশ করতে হলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করলে চলবে না, ভাইয়ের জন্য লড়াই কর। এতগুলো ভাই একত্রে মিলিত হলে, সে শক্তি কত প্রবল হবে ভাব তো! শয়তানের ক্ষমতা যত প্রবলই হোক, এই মিলিত শক্তির প্রবলতার কাছে টিঁকতে পারবে না। তাই ভাইয়ের মাথায় লাঠি মেরে শক্তি ক্ষয় না করে, ভাইয়ের হাতে লাঠি তুলে দাও। সবাই মিলে একত্রে অভিযান কর শয়তানির বিরুদ্ধে। খোঁজ করে দেখ, কোথায় কোথায় চলেছে শয়তানির কারখানা। সেই কারখানাগুলো 'লক আউট' কর —পিকেটিং কর সেখানে।

প্রকৃত রাজনীতি করতে হলে শোষণ ও পুঁজিবাদকে বিনাশ করতে হবে।

সমাজকে বাঁচাতে হলে মূলসমেত তুলে ফেল পরগাছাদের। ক্ষতি করার ক্ষমতা এদের অসীম। মূল গাছকে দিয়ে জল, আলো, হাওয়া সবকিছু সংগ্রহ করাবে, তারপর গাছের শরীর থেকে সেটা শুষে নিয়ে নিজের পুষ্টিসাধন করবে।—এমনি শয়তান! গাছকে তো বাড়তে দেয়ই

না; যে মাটি বা দেওয়াল অবলম্বন করে তারা ওঠে, তার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে শিকড় বিস্তার করে যে, সমস্ত রসটুকু নিঙড়ে নিয়ে তাকে বিচূর্ণ করে ফেলে, অসার করে দেয়। অথচ কেউ তাদের কার্যকলাপ টের পায় না!—এই হলো পরগাছার শক্তি, অলক্ষ্যে থেকে তার জাল বিস্তার করে চলেছে।

সমাজ আজ এমনি পরগাছায় ছেয়ে গেছে। যদি রাজনীতি করতে চাও, আগে পরগাছাগুলোকে চেনো। দেখ, সমাজের কোথায় তারা শিকড়ের জাল বিছিয়েছে। তাদের একটা লিষ্ট তৈরী কর। কোথায় কার গলতি আছে, কে কিভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করছে দেখ এবং সেই-ভাবে তোমার কর্মের গতি স্থির কর। এদের সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তা না হলে সে বিষবৃক্ষে সমাজ ছেয়ে যাবে। তখন সে শক্তিকে রোধ করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

পুঁজিবাদীরা যেমন সমাজের পরগাছা, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ধর্মবীরেরা'ও তেমনি পরগাছা।—ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে শোষণ করে চলেছে। ধর্ম সম্বন্ধে এমন বোঝান বুঝিয়েছে যে, আজ 'ধর্ম' এই কথাটা শুনলেই সকলের এলার্জী হয়। দোষ তো ধর্মের নয়, দোষ হচ্ছে ধর্মের স্বচ্ছ ধারার মধ্যে ভেজালের [illegible] যারা মেশাচ্ছে তাদের। যারা শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে, বাস্তব দশা, শনির দশা বলে, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়ে যাগ-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে অর্থ লুটে নিচ্ছে। এরাও পরগাছা। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে। আমি নিজেই এ পথে থেকে এ'কাজটা করে যাব। চুরমার করে দিয়ে যাব ধর্মের নামে ভেজালের কারখানাকে।

তোমরাও এ বুদ্ধি নিয়ে যদি সত্যিকারের এগিয়ে আসতে পার, তবে এসো। এটাও একটা রাজনীতিরই কাজ। তোমাদের স্বর্গও নেই, নরকও নেই। পাপ-পুণ্যের চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। জন্মেছ যখন, মরতেই হবে। সেই জন্ম-মৃত্যুর মাঝের সময়টিতে যতটুকু কাজ পারবে, করে চলে যাও। শুধু দেখো, ন্যায়ের পথ

যা সব কিছুকে
ধারণ করে আছে

তাহাই ধর্ম। অর্থাৎ সত্যই ধর্ম—ধর্মই ন্যায়—ন্যায়ই রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতি ধর্ম-নীতিতে পার্থক্য কিছু নেই—একটি বরফ, আর একটি জল।

থেকে যেন বিচ্যুত না হও। বেদ বলছে—'যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে তাহাই ধর্ম।' অর্থাৎ সত্যই ধর্ম। ধর্মই ন্যায়। ন্যায়ই রাজনীতি। অতএব রাজনীতির ক্ষেত্র হলো ন্যায়েরই ক্ষেত্র। সুতরাং রাজনীতি আর ধর্মনীতি আলাদা কিছু নয়। শুধু নামে আর রূপেই তফাৎ—বিষয়ে এক। একটি বরফ, আর একটি জল।

প্রশ্ন ঃ—ধর্মশাস্ত্রে কি বাস্তবের বৃহৎ গঠনমূলক কাজের কোন নির্দেশ আছে?

উত্তর ঃ—ধর্মশাস্ত্র এমন বুনোট করে তৈরী করা—যেটা সবাই ব্যবহার করতে পারে। সে বুনোটটা হলো জীবজগতের সব। সেটাকেই আমরা ব্যবহার করছি। এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ে যা কিছু হচ্ছে সবটাই শাস্ত্র। শাস্ত্র হচ্ছে এমন একটা দর্পণ যে, সবাইকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এ জগতে যে যা কিছু করছে, যা কিছু বলছে—সবটাই শাস্ত্রের কথা। বিশ্বের

শাস্ত্রের সার কথা হ'ল—তুমি চালিত হও তোমার 'সচেতনতা'র দ্বারা।

যাবতীয় বিষয়বস্তুর সার কথাই হলো শাস্ত্রের কথা। সেই সার কথা—মাত্র একটি কথা। ভেতরকার সচেতনতার সাথে হাত মিলিয়ে যে মিশে চলবে, সেই হলো একমাত্র শাস্ত্রের অধিকারী। শাস্ত্রের মর্মকথা হলো "—তুমি চালিত হও তোমার সচেতনতার দ্বারা।" এই কথাটি শুনবার ও শোনাবার জন্যই অগণিত গ্রন্থের সৃষ্টি হয়ে গেছে। সাবধানতার কথা, সতর্কতার কথা অন্তরের বাণী থেকেই পাওয়া যায়, শাস্ত্রের বাণীতে খুঁজতে হয় না। সৃষ্টিতত্ত্বে অন্তর্নিহিত হৃদয়ের অন্তস্তলে এক মহামণি নিহিত আছে। ঐ আলোকে যে আলোকিত, সেই হলো সর্বজ্ঞের স্তরে। মহামূল্য বস্তু অতি সহজ বস্তুর মধ্যেই রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়—আমরা সেই মহামণির উপর আবর্জনার বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছি।—সময় এখনও আছে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি তো বলেন, প্রাচীন ভারতের বৈদিক ভাবধারাই বর্তমান জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার জেগে উঠছে। আজ মানুষ যে একেবারে চাঁদে চলে গেলো, সেকথা কেউ কখনও কোনদিনও চিন্তা করতে পারে নি। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।—ভারতীয় শাস্ত্র ও পুরাণে কি এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে ?

উত্তর ঃ—শুধু চাঁদে যাওয়া কেন, চাঁদ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ মাইল দূর নক্ষত্রলোকে যাওয়ার কথা ভারতের মুনি-ঋষিরা, চিন্তা করেছিলেন। সেখানে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনা করেছিলেন। 'ধ্রুব'র কাহিনীই তার প্রমাণ। সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে সাধনা ও তপস্যা করার পর সোনার রথে চড়ে গেলেন ধ্রুবলোকে। এই সোনার রথের মধ্যে বর্তমান জগতের রকেটের idea কি পাওয়া যাচ্ছে না ?

কেবলমাত্র গ্রহান্তরে যাওয়াই নয়, এখন আমরা বিজ্ঞানের যতরকম প্রকাশ দেখছি, খুঁজলে পরে ভারতীয় শাস্ত্রে সে সবকিছুর মূলভাব পাওয়া যাবে। সে যুগের 'জ্ঞান' আর এ যুগের 'বিজ্ঞানের কথায় পার্থক্য কিছুই নেই। একটা formula, আর একটা তার প্রয়োগ। এরোপ্লেন আবিষ্কার হওয়ার অনেক আগেই ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থে পুষ্পকরথে চড়ে দূরের পথ মুহূর্তে অতিক্রম করার কথা পাওয়া যায়। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করাও প্রাচীন ভারতে সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া এক মুহূর্তে সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়ার মত অস্ত্রের কথাও ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যদিও তাঁরা সেই পাশুপত অস্ত্র কখনও ব্যবহার করেন নি। তাঁরা মনে করতেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনও এই সর্বনাশা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা—সব কিছু ধ্বংস

বৈদিক যুগের 'জ্ঞান' আর বর্তমান যুগের 'বিজ্ঞান'-এর কথায় কোন পার্থক্য নেই। একটি formula, আর একটি তার প্রয়োগ। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই যা ছিল সীমাবদ্ধ, বর্তমান বিজ্ঞান তাকেই সমগ্র পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছে।

করা নয়। তাই দেশের শান্তি রক্ষার্থে যতটুকু অস্ত্র প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ততটুকুই তাঁরা করেছেন। পাশুপত অস্ত্রের formula ও প্রয়োগবিধি জানা থাকা সত্ত্বেও তা তাঁরা ব্যবহার করেননি। এই পাশুপত অস্ত্র আর বর্তমানের এটম্ বম্ব—আলাদা কিছু নয়। ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ, বেদ ইত্যাদি ঘেঁটেই জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত অস্ত্রের formula খুঁজে পেয়েছেন এবং V—I, V—2 ইত্যাদি মারণাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমি মনে করি। জার্মানরা যে ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি থেকে অনেক কিছু সম্পদ, অনেক কিছুর formula আহরণ করেছেন, একথা তাঁরা নিজেরাও বহুবার স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের খ্যাতির মূলে তাঁরা যে ভারতবর্ষের কাছে ঋণী, এ কথাও তাঁরা অস্বীকার করেননি।

বেদে মন্ত্রকে সিদ্ধিলাভের উপায় বলেছে। অর্থাৎ বলেছে, মন্ত্র-বলেই সমস্ত অসাধ্য সাধন করা যায়, আরাধ্য বস্তু আয়ত্তে আনা যায়। বেদের যুগে মুনি-ঋষিরা যে কাজ করবেন বলে স্থির করতেন, সেই কাজের ভাল-মন্দ প্রতিটি দিক নিয়ে তাঁরা প্রথম মনন করতেন। একাগ্রভাবে মননের সাথে সাথে চিন্তার বস্তু তাঁরা পেয়ে যেতেন। এটা কিভাবে হোতো তার কারণ স্বরূপ বলেছেন, মন্ত্রশক্তিতেই এটা সম্ভব হয়। যে কোন কাজে মনোনিবেশ করার শক্তিকেই তাঁরা মন্ত্রশক্তি বলেছেন। মনে মনে মনন করে মন্ত্রণায় চালিত করতেন বলেই তাকে মন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় রাজা চালিত হন, সেইরকম মনের মন্ত্রণায় সবকিছু চালনা করা যায়। সেইজন্যই বেদে মন্ত্রকে এতবড় স্থান দেওয়া হয়েছে। আজ 'মন্ত্র' কথার অর্থ বিকৃত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 'মন্ত্র' কথার প্রকৃত অর্থ মনন করা। মন্ত্রশক্তি—মনকে নিবিষ্ট করার শক্তি। যে কোন কাজে এই মন্ত্রশক্তিকে যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা যায়, তবে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মন্ত্রই সিদ্ধিলাভের উপায়।

আজ যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে চাঁদে যাওয়া হয়েছে,

এর পেছনেও সেই মন্ত্রশক্তিই কাজ করেছে। আমেরিকা বা রাশিয়া একাগ্রভাবে একটি কাজে মনোনিবেশ করতে পেরেছে বলেই তাদের সাধনায় তারা সফল হয়েছে। একাগ্রতাই সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতের মুনি-ঋষিদের সাধনায় একাগ্রতা ছিল, একনিষ্ঠতা ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে সমস্তরকম কাজে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। এই শক্তির প্রেরণাতেই তাঁরা চন্দ্র-লোকে, নক্ষত্রলোকে, এমনকি সূর্যলোকেও, শুধু যাওয়া নয়, যাওয়া-আসার কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা যে কথা সেদিন চিন্তা করেছিলেন, সে কথাই আজ কার্যে পরিণত হচ্ছে। সে জন্যেই বলেছি, তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অর্থাৎ মুনি-ঋষিরা যে সমস্ত formula দিয়ে গেছেন, আজকালকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা সেটাকেই বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন।

তাঁরা যে শুধু চিন্তাই করেছেন মাত্র, একথা বলা চলে না। কারণ, প্রয়োগ করে formula-র সফলতা যাচাই না করে কেউ কখনও জোরগলায় কোন ফরমূলা দিতে পারে না। এই formula পরীক্ষা করতে গিয়েই তাঁরা এমন সমস্ত জিনিস তৈরী করেছেন, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও যার তুলনা চলে না। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, সমস্ত দিকে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের দান অতুলনীয়। একথা শুধু আমরাই স্বীকার করি না, পৃথিবীর সকল দেশবাসী একথা একবাক্যে স্বীকার করেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মত শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য আজ পর্যন্ত খুব কম দেশেই সৃষ্টি হয়েছে ; সে কথা সকল দেশের সকল যুগের ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেন। আজও দেশ বিদেশ থেকে বহু ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, পুরাতত্ত্ববিদ, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়াররা এদেশে এসে প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, শহর প্রভৃতি দেখে যান, তাদের নির্মাণ-কৌশল নিয়ে গবেষণা করেন এবং সেইভাবে সব কিছু তৈরী করতে চেষ্টা করেন। শুনেছি, পুরীর মন্দিরের জগন্নাথের ভোগ রান্নার কৌশল দেখে ইক্‌মিক

কুকার আবিষ্কার হয়েছে। এতো একটা সামান্য পদ্ধতি। এ রকম বহু কিছুর নির্মাণ-কৌশল, পদ্ধতি ভারতীয় বহু শাস্ত্রে, গ্রন্থে ফরমূলার আকারে রয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে মনে হবে, অলৌকিক প্রক্রিয়ায় তৈরী। কিন্তু তাদের প্রকৃত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে দেখা যাবে, সে সমস্তই বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ সমস্তই আজকাল এক একটি রিসার্চের বিষয়বস্তু হতে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও দেখ, প্রাচীন ভারতের মত অগ্রগতি ঠিক সেই সময়ে অন্য কোন দেশে পাই না। বেদে অরণ্য, বনস্পতি ও ভেষজকে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছে; এদেরও দেবতা বলে পূজা করা হতো। এগুলি থেকে তারা নানারকম ঔষধ-পথ্য তৈরী করে নিজেদের প্রয়োজনে অসুখে-বিসুখে ব্যবহার করত। তাই এদের খুশী করার জন্য বিভিন্ন বনস্পতি ও ভেষজের গুণ বর্ণনা করে বহু শ্লোক রচিত হয়েছে। সেই সমস্ত শ্লোক থেকে ফরমূলা গ্রহণ করে আজকাল ভারতবর্ষে এবং বিদেশের ল্যাবরেটরীতে যে সমস্ত ঔষধ তৈরী হচ্ছে, সেগুলির কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে কারুরই কোন সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত ভেষজ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, তার প্রমাণ পাই রামায়ণে। শক্তিশেল দিয়ে যাদের মেরে ফেলা হয়েছিল, বিশল্যকরণী দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে তোলা হলো।

আজ যে রাশিয়া থেকে 'লুনা' ছাড়া হয়েছে, মানুষ ছাড়াই সে চন্দ্রলোক পরিক্রমা করেছে। মানুষ যেভাবে instruction দিয়ে মেসিনকে যেখানে পাঠাচ্ছে, মেসিন ঠিক সেই মত সেই জায়গায় গিয়ে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার প্রেরকের কাছে ফিরে আসছে। তোমরা মনে করছ, এটা বর্তমান যুগের মস্ত আবিষ্কার। কিন্তু এ নিদর্শনও আমরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পাই। নানারকম instruction দিয়ে বিভিন্ন রকম অস্ত্র তখন তৈরী হতো—অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ, শক্তিশেল ইত্যাদি। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ সেরে আবার সেই

সমস্ত শেল নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসত। এগুলি যে শুধুমাত্র গল্পকথা নয়, তার প্রমাণ আজকের বিজ্ঞান-জগৎ। এক সময় এগুলিকে আজগুবী কাহিনী বলে অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, যেমন আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কাছে 'এক টাকা চালের মণ এক সময় ছিল'—এ কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এক সময় সেটাই সত্যি ছিল। আজ সেটা চাপা পড়ে গেছে। সেই রকম প্রাচীন ভারতের মহিমা মাঝে চাপা পড়ে গিয়েছিল; বর্তমান বিজ্ঞান তাকেই আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। যা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমান বিজ্ঞান তাকেই সমগ্র পৃথিবীর কাছে তুলে ধরছে।

প্রশ্ন ঃ—বাস্তবের দিকটা না হয় অনেকভাবে সমাধান করা চলে; কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এর সমাধান কোথায়?

উত্তর ঃ—সৃষ্টির নিয়মে প্রকৃতির গতির সাথে গতি মেলাবার জন্য সৃষ্ট বস্তুগুলো সেইভাবেই গঠিত হয়ে আসছে। জীবজগতের প্রয়োজন অনুযায়ী যা' যা' প্রয়োজন, বিশ্বপ্রকৃতির গতির ভেতর সেই প্রয়োজনীয় ও প্রশ্ন মেটানোর বিষয়বস্তুগুলো জগৎ সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই মহাশূন্যের ফাঁকাতে ফাঁকার সামিল হয়েই ছিল। আজ এই জীবজগতের প্রতি বস্তুতে বস্তুতে আমরা সেটা অনুভব করছি। শিশু জন্মাবার সাথে সাথে স্তনে দুধ আসে। এটা খুবই আশ্চর্য ও চিন্তা করার বিষয়। তেষ্টার সাথে সাথে তার নিবারণের উপায়, শিশুর ক্ষুধা জাগার সাথে সাথে তার সমাধান দেখতে পাই। ঠিক মনে হয়—কে যেন এগুলো বুঝে বুঝে করে যাচ্ছে।

সৃষ্টির নিয়মে, আমাদের মধ্যে যে চাহিদাই জাগুক—আত্মিক বা বাস্তবিক, তার প্রত্যক্ষ সমাধান সম্ভব।

আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দিক থেকে চিন্তা করলেও বেশ বুঝা যায়। শরীরের নখগুলো রয়েছে আত্মরক্ষার জন্য। লোমগুলো আছে ধূলোবালি-জীবাণুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আমাদের হাত-পা

আছে চলাফেরার জন্য। দেহের ইন্দ্রিয়গুলো যেন প্রতি বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য সজাগ রয়েছে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেমন আমাদের প্রয়োজন ছাড়া নয়, মনের ভাব-ভাবনা-চিন্তাগুলোও প্রয়োজন ছাড়া নয়। অযথা এগুলো আসে না বা জাগে না।

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেমন আমাদের প্রয়োজন ছাড়া নয়, মনের ভাব-ভাবনা-চিন্তাগুলোও তেমনি প্রয়োজন ছাড়া নয়—অযথা এগুলো আসে না বা জাগে না।

বাস্তবে ইন্দ্রিয়গুলির সুখ-সুবিধা-শান্তির জন্য অনেকেই বহুপ্রকার পথ অবলম্বন করে থাকে। সফল, অসফল কে হলো বা কে হলো না, তার উপর গুরুত্ব কিছু নেই। সফল হওয়া যায় বা হওয়ার উপায় আছে—এটাই সমাধান। চেষ্টা করলে সমাধানের বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়—সেটাই সব। এখানকার চাওয়া-পাওয়াতে আর মন টিঁকছে না বা ভাল লাগছে না, তারজন্য মন কিন্তু চাওয়া শেষ করে বসেনি। তার উপর আরও চায়। এখানকার কোন আনন্দে যখন আর শান্তি পাচ্ছে না, তখন ভেতর থেকে জাগতে থাকে—এখানকার চাওয়া মনে হয় যেন সাময়িক। জগতে এমন একটি চাওয়ার বস্তু আছে, যারপর আর চাওয়া নেই। মন তখন তাকেই খুঁজে বেড়াতে থাকে। এখানকার আর কিছুই যখন ভাল লাগে না, মন যখন কোথাও বসতে চায় না, তখনই চলে যেতে চায় কল্পনার রাজত্বে। কিন্তু বুঝতে হবে—কেন সে ভাবনার রাজত্বে ভেবে চলেছে? কেন মন বসে নেই? সে কোন্ চাওয়ার দিকে যাচ্ছে? তার সে তেষ্টা নিবারণের বস্তু এখানে নেই; কিন্তু তেষ্টা যখন আছে—মেটানে র বস্তুও আছে। তারই সন্ধানে সে চলেছে। এটাই গতির নিয়ম। যাঁরা ভাবতে ভাবতে সমস্ত বিশ্বের অনন্ত পরিপূর্ণতার গতির সাথে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছেন, বাস্তবের সাময়িক পরিপূর্ণতার আনন্দের মত তাঁরা পাচ্ছেন বিরাট আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ।

মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোথা থেকে গায়ে এলো এক ফোঁটা জল। সাময়িক আনন্দে মন তখন উথাল-পাথাল হয়ে ভাবতে লাগল—এমন এক জায়গা আছে যেখানে অগণিত ফোঁটা আছে—যার

শেষ নেই। এতটুকু সাময়িক আনন্দের ফোঁটা অগণিত আনন্দের ফোঁটার সাথে একত্রিত হয়ে—আছে সেই মহাসাগর। কোথায় সেই মহার্ণব, যার এক ফোঁটার আনন্দে বিশ্বজগতের জীব আত্মহারা হয়ে তার পেছনে ঘুরছে? কলসের জল পান করলে ফুরিয়ে যায়। তাই আনন্দ এখানে সাময়িক। কিন্তু যার শেষ নেই, মন সেই আনন্দের খোঁজেই উথাল-পাথাল করতে শুরু করে। তারই জন্যই আমরা বলে থাকি—মন চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত। কিন্তু মন চঞ্চল নয়, বিক্ষিপ্ত নয়, সে গতির ধারাতে ঝরণার জলের মত বয়ে যেতে চায়।

অনন্ত মহাকাশে আজ যা অজানা রয়েছে, সেখানে উঠতে হলে কিভাবে উঠতে হবে জানা না থাকলেও, উঠবার ইচ্ছা ষোল আনা থাকলে উঠবার উপায় আপনা থেকেই জড় হবে। আজ যাগ-যজ্ঞ অনেকের কাছে পাগলামি হতে পারে; কিন্তু যারা উঠবার জন্য পাগল—তাদের কাছে নয়। তারা এই শাস্ত্র-মন্ত্র, বিধি-ব্যবস্থাকে উচ্ছ্বাস বলে মনে করে না। তারা ভাবছে—মন্ত্র বা ধ্বনির বিধিব্যবস্থাকে অবলম্বন করেই মহাশূন্যের যাত্রিক হওয়া যায়।—যাত্রীসহ নৌকা ডুবে গেছে—নৌকাডুবিতে অনেকেই জলে পড়ে গেছে; প্রত্যেকেই হাতড়াচ্ছে বাঁচবার জন্য—একে অন্যকে ধরে রেখেছে পারে উঠবার জন্য। কেউ অনেক জল খেয়ে পারে উঠেছে, কেউ যাকে সামনে পেয়েছে তাকে ধরে পারে উঠেছে। তারপর পারে উঠে দেখল—যাকে অবলম্বন করেছিল, সেটা একটা গলিত মৃতদেহ। সুতরাং অবলম্বন যখন পেয়ে গেছে, তখন সেটা বেলপাতা, না তুলসীপাতা, না সেওড়াপাতা—সেটা ভাববার কথা নয়। যখনই মন অবলম্বন চায়, তখনই প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তা আপনি এসে উপস্থিত হয়। স্তনে দুধ আসার মত পরিপূর্ণতার সন্ধান তার মধ্যেই পাওয়া যায়। অযথা মনে কিছু আসে না। যেটা আছে, সেটাই আসে।

এখানে একজন আর একজনকে ডাকলে সে শোনে। কুকুর বিড়াল সবাই অন্তরের ডাকে পোষ মানে। অন্তরের সুরের সাথে আর বাইরের ধ্বনির সাথে একত্র করে মনেপ্রাণে যদি ডাকা যায় বা চিন্তা করা যায়

তবে বাস্তবে সব কিছুই সফল হয়। বাস্তবের এই সফলতা বিশ্ব-বিরাটের সফল হওয়ার পূর্বাভাস। এ ঘর থেকে ও ঘরে ডাকার সময় গলার স্বর যত চড়াই, চার ঘর পরের জনকে ডাকতে হলে গলার স্বর আরও চড়াই, পুকুর-পার ছাড়িয়ে ডাকতে হলে স্বরের মাত্রা আরও বাড়াই। যত উঁচু স্বরে ডাকি, তত দূর থেকে শুনতে পায়। সেইরূপ পাঁচহাজার গুণ চিন্তাধারা আর ভেতরের উঁচু সুরের মাত্রা দিয়ে যদি আমরা আমাদের কাজ করে যাই, তবে নিশ্চয়ই একটা কিছু পাব।

বিশ্ব-প্রকৃতির বিষয়বস্তুগুলো একভাবে না একভাবে সজাগ দেখতে পাচ্ছি। এখানকার সজাগেই কত কাজ করে থাকি; আর প্রকৃতির গতি, সেটা তো অতি সজাগ! আমাদের সুরের মাত্রা অনুযায়ী কাজ করে গেলে সেই সজাগের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের সঙ্গে এই ভাণ্ডার যখন একসুরে যুক্ত হবে, তখন অফুরন্ত তৃপ্তি ও আনন্দের ঢেউ গঙ্গার বানের মত এসে ভরপুর করে দেবে। এটাই যোগ। সৃষ্টির নিয়মে সমাধান করেই সৃষ্টি হয়েছে। জগতের সব কিছু লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আমাদের ভেতর থেকে যেমন চাহিদা জাগে, তার সমাধানও বাস্তবেই এসে দাঁড়ায়।—সেটা সহজেই হোক আর কষ্টেই হোক।

প্রশ্ন :—আমাদের এখানে যাঁরা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে সাধনা করছেন, তাঁরা কি সাম্যবাদের সাধনা করছেন? আপনি সাম্যবাদ বলতে যা বোঝাচ্ছেন—তাঁরা তো সেটাকে নাস্তিক্যবাদই বলেন। সুতরাং তাঁদের কি সাম্যবাদী বলা চলে?

উত্তরঃ—যে কোন যানবাহনে পৃথিবীর উপর যতক্ষণ বিচরণ করা যায়, ততক্ষণ দেশের পর দেশই পাওয়া যায়—লেখনীতে তার অনেক সংবাদই দেওয়া যায়। পৃথিবীর উর্ধ্বে যখন যেতে হয়, তখন পৃথিবীর পর পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যখন বিচরণ করবে, তখন তার কি বর্ণনা করবে? কেবল শূন্য—কেবল শূন্য। একই ব্যক্তি, যখন পৃথিবীতে বিচরণ করছিল তখন তার লেখা একরকম ছিল, যখন মহাকাশে বিচরণ করছে—

তখন তার ভাব ভাষা সব অন্য রকম। কোন্‌টা ঠিক? এই পৃথিবীতে যাঁরা দেব-দেবতার সাধনা আরাধনা করছেন, তাঁরা একরকম কথা বলছেন ; এর ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে পারলেই তাঁরা বুঝবেন—এটা শুধু মানচিত্রের মত। বাচ্চা বয়সের খেলনার মত—রান্না শিখলে, খেলনার রান্না আর থাকে না। চিন্তা যখন আরও প্রসারতায় চলে যাবে, দেব-দেবীর মূর্তিগুলো তখন খেলনার মত মন থেকে সরে যাবে। গানের শব্দগুলো, বিরহ-বৈরাগ্যের পদগুলো ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুরে ডুবে যায়। তারপর শুধু সুর—সুদূরের সুর, সেখানেও শূন্যেই যেন লীন। শুধু সাধু-সন্ন্যাসী-ধার্মিক কেন, প্রত্যেক মানুষ, সমস্ত জীব মহাশূন্যের যাত্রিক হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করছে পৃথিবী-রূপ স্পুট্‌নিককে অবলম্বন করে। শূন্যে যাদের গতি—যাদের আশ্রয় শূন্যে, সর্ব দিকে চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে তারা শূন্যকে পূরণ করতে করতেই চলেছে ; কিন্তু শূন্য শূন্যই থেকে যাচ্ছে। আশা আকাঙ্ক্ষা সবই সেইরূপ। ক্ষুধা পূরণ করার তাগিদে ছুটে চলেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কোন ক্ষুধাই পূরণ হচ্ছে না। পূরণ করার প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু সজীব হয়ে উঠেছে। সজীবতা তারই আভাস। বেদ বেদান্ত গ্রন্থাদি মহাশূন্যে আশ্রিত বিষয়বস্তুরই তথ্য। আর তথ্যই তত্ত্ব। তত্ত্বের যে অস্তিত্ব, তার তত্ত্বে যখন যাওয়া যায়, তখন সর্ব-হারা হয়ে এক বিরাট ফাঁকার মধ্যে পড়তে হয়। সেই ফাঁকায় যখন সব কিছু হারিয়ে যায়, তখন সব বস্তুর অস্তিত্ব 'নাই' হয়ে যায়। পরিশেষে ভেতর থেকে একটা 'নাই নাই' ভাব জাগতে থাকে। সেটাই নাস্তিক ভাব। এই 'নাই নাই' থেকেই কোথায় যেন একটা কি আছে বলে মনে হয়।—সেই ভাবনাতে আরও ভাবতে থাকে। তারপর ভাবতে ভাবতে এইটুকু ভাবনায় আসে—'নাই' কথাটা কেমন করে বললাম? যে ভাবনা-চিন্তা দিয়ে 'নাই'কে স্বীকার করে আসছি, সেটাতো

দেব-দেবীর মূর্তি-গুলো ছোটবেলার খেলনায় রান্নাশেখার মত। চিন্তার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো মন থেকে সরে যায়।

বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই 'আছে' এবং 'নাই'—এই দুটি কথাকে স্বীকার করছে। এ দু'য়ের সমদৃষ্টিই সাম্যবাদ।

আছে ! 'আছে' খুঁজতে খুঁজতে 'নাই' হয়ে যায়, আবার 'নাই' খুঁজতে খুঁজতে 'নাই'-টাকেই 'আছে' বলে ভেবে নেয়। অতদূর ভাবতে অসুবিধা হয় বলেই ঐ ভাবনাতে যাতে কেউ ভাবতে না যায়— তাই 'নাস্তিক' কথাটা দিয়ে অঙ্কের ফলটা আগেই জানিয়ে দেয়। সেটাই নাস্তিক্যবাদ। জীব চায় অবলম্বন। অবলম্বনবিহীন চলা খুব অসুবিধা। মহাকাশ এমন একটা দর্পণ যে, 'আছে' বললেও আচ্ছা, 'নাই' বললেও আচ্ছা। দুটো মুখই দেখা যায়। জগতের পরিধির মধ্যে যেটা অতি সহজলভ্য, সেইটাকে বেশীর ভাগ অবলম্বন করছে। একটু বিচার করলেই আমরা সমান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে উপলব্ধি করছি। সমান দৃষ্টি যেখানে, সাম্যবাদ সেখানেই। সাম্যবাদকে শুধুমাত্র নাস্তিক্যবাদ বললে চলবে কেন ?

প্রশ্ন ঃ—আপনি বলছেন, একটি সম্প্রদায় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং সমাজে আধিপত্য করার জন্য বেদের কথারই মনগড়া অর্থ করে লোককে বিভ্রান্ত করেছে, আর তারই ফলে আজ সমাজ সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মহাপ্রভু নিজেও তো দ্বারে দ্বারে নাম-কীর্তন প্রচার করেছেন। তিনিও কি বেদের অর্থ বিকৃত করতে সাহায্য করেছেন ?

উত্তর ঃ—মহাপ্রভু নিজেই ছিলেন বেদের পূজারী। বেদের এক-ধর্ম একনীতি তিনি জানতেন। সম অধিকারের কথা, সাম্যবাদের কথা তিনিও বলেছেন, কিন্তু অন্যভাবে। যখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, তখন দেশ ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্তে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—সমাজকে এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় ? তিনি যদি তখন তাদের জ্ঞানের কথা, বেদের কথা বোঝাতে চান, তবে কেউ তা শুনবে না। একথা বুঝেই তিনি অন্যপথ ধরলেন। বিদেশী রাজাকে আপ্যায়িত করতে হলে নিজের দেশের flag-এর সাথে সাথে তাদের দেশের flagও ওড়াতে হয়। প্রথম তাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে তাকে আকৃষ্ট করে তারপর

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের সংস্কারকে হাতিয়ার করে ধর্মকে সংস্কার-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

স্বদেশী গান শোনাতে হয়—তবেই সে শুনবে। সেই বিভ্রান্ত অবস্থায় মহাপ্রভু যদি বোঝাতে যেতেন—তোমরা যা করছ তা ঠিক নয়, তবে হিতে বিপরীত হতো। তাই তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত সংস্কারের ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেই অগ্রসর হলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, সবাইকে একত্রিত করলেন, দ্বারে দ্বারে নামকীর্তন প্রচার করলেন—ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই নাম উচ্চারণ করে দুবাহু আকাশে বিস্তার করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনে নিলেন। উদ্দেশ্য—বেদের সাম্যবাদ প্রচার করা। জ্ঞানের পথ ধ'রলে এরা শুনবে না। তাই অন্যপথ ধ'রলেন। তাদেরই সংস্কারের পতাকা হাতে নিয়ে সাম্যের ধ্বজা ওড়াতে চাইলেন। ভক্তির পথ ধরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের বীজ অনুপ্রবিষ্ট করতে লাগলেন।

কৃষ্ণবর্ণ আকাশের বর্ণ—যে বর্ণ খুঁজলে পাওয়া যায় না। অথচ সেই বর্ণ অন্য সকল বর্ণকে হরণ করে নেয়। কৃষ্ণ ও রাম উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাঁরা আকাশস্বরূপ। তাঁরা সব কিছু হরণ করে নিয়ে যান—অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই সব কিছু আশ্রয় গ্রহণ করে ; এই অনন্ত নীল আকাশেই সমস্ত পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আশ্রয় নিয়েছে। এই কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্যে সবকিছু একত্রিত হয়ে আছে। তারই নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ বা রাম। তিনি সব কিছু হরণ করেছেন অর্থাৎ গ্রহণ করেছেন। তাই প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ কর—'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম।' এই কৃষ্ণ ও রাম নাম স্মরণের মধ্য দিয়েই বেদের বিভিন্ন ধারা ও নীতির কথা সকলের সামনে তুলে ধরলেন।

কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্যই 'কৃষ্ণ' বা 'রাম' রূপে আখ্যাত। এই মহাশূন্যেই বিশ্বের সকল গ্রহ নক্ষত্র সাম্যনীতিতে বিধৃত। তাই 'রাম' 'কৃষ্ণ' স্মরণে সেই সাম্যনীতিকেই স্মরণ করা হয়।

মহাপ্রভু নাম-কীর্তনের সাথে দুহাত বিস্তার করে দিলেন আকাশের দিকে—অনন্ত নীল আকাশে, যার থেকে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, আবার যার মধ্যে সমগ্র জগৎ আশ্রয় লাভ করেছে। আমাদের

দেহ-মন-বুদ্ধি-বিচার আকাশের মতই বিস্তৃত, আবার আকাশেই বিধৃত। সেই এক আকাশে প্রকৃতির সব কিছু সমসুরে সমনীতিতে বাঁধা, সাধা, গাঁথা। সেখানেও সাম্যবাদের সুর মহাপ্রভু তাই দু' হাত তুলে আকাশকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবার মুখেও 'কৃষ্ণ-রাম' নাম—যাঁরা নীলবর্ণ আকাশেরই প্রতীক।

নাম কীর্তনের আবার একটি ব্যবহারিক দিকও আছে। সেটাও বেদের সাম্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই এই নামে সম অধিকার আছে। অতএব সকলে এক হয়ে এক আসনে অস্পৃশ্যতা ভুলে গিয়ে নাম কীর্তন কর। এতে প্রভাতে ওঠা অভ্যাস হবে, একত্রিত হয়ে ব্যায়ামের কাজ হবে, সঙ্গীত চর্চা হবে, পরিচ্ছন্নতা শেখা হবে, পরিমিত আহার অভ্যাস হবে, জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা আসবে, মনও একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে।

বেদের যে জ্ঞান, বেদের যে সত্য তা হিতোপদেশ দিয়ে জনগণকে বোঝান যাবে না। তাই যুগে যুগে বেদের অনুসরণকারীরা নানা রূপের মাধ্যমে সেই তত্ত্বকে রূপ দিয়েছেন, বাস্তবের ঘটনার মধ্য দিয়েই তাকে বোঝাতে চেয়েছেন। এইসব রূপকগুলিই পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত।

আবার সাম্যবাদের দিক থেকে নাম-কীর্তনের আর এক অর্থও আছে। কৃষ্ণ হচ্ছে রাখাল, আর রাম হচ্ছে রাজা। সমাজে দু'জনেরই সমান স্থান।

ব্যবহারিক দিক থেকেও নাম-কীর্তন বেদের সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দু'জনকেই সমভাবে স্মরণ কর। একজনের কাছে ধেনু, আর একজনের হাতে ধনু। ধেনু কৃষির প্রতীক। বেদে কৃষিকার্যকেই অর্থাগমের প্রধান উপায় বলেছে। বেদের যুগে কৃষিকর্ম যজ্ঞের মত পুণ্যকর্ম ছিল। ধনু যুদ্ধের প্রতীক।—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ধেনুই প্রধান অবলম্বন; কিন্তু প্রয়োজন হ'লে ধনুর্বাণও ধরতে হবে। রাম ধনুর্বাণ ধরেছিলেন সীতা অর্থাৎ সহধর্মিণী স্বরূপ ভূমিদেবীকে দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে। এই কাজে শরণ নিলেন মহাবীরের অর্থাৎ সমগ্র গণশক্তির। মহাবীর গণদেবতারই প্রতীক।

আজও যাঁরা নাম করছেন, গান করছেন, এসব তত্ত্বকথা তাঁদের কাছে বিকোবে না। তাই সংস্কারের ছুরি হাতে নিয়েই সংস্কারকে অপারেশন করতে হবে। সংস্কারমুক্ত মন তৈরী করতে হবে। তবেই সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করা সম্ভব। সংস্কারের পতাকা উত্তোলন করে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের সামনে উড়িয়ে দিতে হবে সত্যের নিশান। সংস্কারের মধ্য দিয়ে গিয়েই ন্যায়ের দণ্ড হাতে তুলে দিতে হবে, জ্ঞানের ধ্বজা গেঁথে দিতে হবে।

সংস্কার-অস্ত্রের দ্বারাই সংস্কার-আশ্রয়ীদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ—এখন সর্ব বিভাগেই তো দেখছি গলদ ঢুকে বসে আছে, এদের দূর করবার পথ কি ?

উত্তর ঃ—জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি State যখন দেখবে, তখনই গলদ পনের আনা দূর হবে। তবুও যে এক আনা থেকে যাবে, ওটা খাদ।

প্রশ্ন ঃ—State নিলে সবার চলার অসুবিধা হবে না কি ?

উত্তর ঃ—তখন হবে সেটা একান্নভুক্ত পরিবারের মত। বাড়ী গড়ার বৃত্তিতে যে মনোবৃত্তিটুকু থাকে, দেশ গড়ার চিন্তায় তখন সবার সেই চিন্তা জাগবে। যে যতটুকু কাজে নামবে, তার মধ্যে ফাঁকি থাকবে না। তখন সে বুঝবে —ফাঁকি দিয়ে আমার লাভ কি ? ফাঁকি বুদ্ধিটা তখন আসবে না,—ওষুধ পকেটস্থ করে নিজের সন্তানকে যেমন distilled water দিয়ে বুঝ দেওয়া হয় না, তেমনি জাতির অবনতির ভাবনা এত বেশী মনের মধ্যে ঢুকে পড়বে যে, State আমাদের father-mother হবে। এখন State আমাদের মাতুলালয় বললে তো ভাল বলা হয়, মামার শ্বশুরবাড়ী ; সরলভাবে বলতে গেলে State-এর সঙ্গে আমাদের এর চেয়ে বেশী সম্পর্ক নেই। তাই কেরাণী সহজ সরল মনে তার কলম চালাতে পারে না ; ঝাড়ুদারের ঝাড়ুর আগায়, ডাক্তারের ইনজেকসনের আগায় তাই গলদ ঢুকে আছে। কৌশলে, ফাঁকি দিয়ে অর্থ কি ভাবে পকেটস্থ করবে—এই চিন্তাই হ'ল প্রবল। State সব নিলে

রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজই সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

এগুলো আর হয় না। শুরুতে সাময়িক অসুবিধা হবে, কিন্তু শতকরা নব্বইজন ব্যক্তি প্রাণ পাবে, ভুঁড়িওয়ালা দু'দশজনের অসুবিধা হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের কাছ থেকে tax নিয়ে যাচ্ছে—আমরা বরদাস্ত করছি—পুরুষত্বের অভাব বলে। নইলে একদিনে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়। তাই, অবিলম্বে একত্র হয়ে যা করা দরকার তাই করা উচিত।

প্রশ্ন ঃ—আপনি State সম্বন্ধে যে কথা বললেন, কার্ল মার্কস্ অনেক আগেই তো একথা বলে গেছেন! কই, এটা তো কোথায়ও সম্পূর্ণভাবে হ'চ্ছে না?

উত্তর ঃ—কে কি বলেছেন তা আমি জানি না—আমাদের বেদ ও শাস্ত্রে আছে। শুধু কার্ল মার্কস্ একথা বলবে কেন, সব mass-ই একথা বলবে—ভাল কথা সবাই বলবে। পাড়া ছেড়ে কেউ ময়দানে বাসা করতে চায় না, প্রতিবেশী নিয়েই বাস করতে চায়—এটা জীব জাতির স্বভাব। বনে যাও, জলে-স্থলে যেখানে যাও, তাদের মধ্যে unity দেখতে পাবে। তাদের কে বলতে গিয়েছিল? আজকে এই unity-টাই দরকার। জল উৎপাদনের ব্যবস্থা যদি নিজেদের হাতে থাকত, তবে কেউ জল পেত না; Nature-এর হাতে আছে বলেই পাচ্ছে। State-টা হবে Nature-এর মত, সর্বদিকে দিতে যার কার্পণ্য নেই। সেইরকম অভিজ্ঞ ও উদার হস্তে State পড়লে জাতির কল্যাণ হয়। সব খাল, বিল, নদী যেমন সাগর অভিমুখে চলে, সেই রকম জনসাধারণ—ধনী-গরীব নির্বিশেষে একমুখী হয়ে যদি চলে, তবেই current নিয়মিত চলবে।

দলবদ্ধ হয়ে বাস—এটা সকল জীবের সংজাত স্বভাব, কারও শেখানর অপেক্ষা রাখে না। শুধু চাই উদার ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব।

প্রশ্ন ঃ—আজ চলে না কেন?

উত্তর ঃ—এত ডোবা হয়ে পড়েছে যে, এগুলো এখন পচতে শুরু করেছে। ডোবায় current কোথা থেকে আসবে? ডোবাগুলোকে current-এর সাথে যুক্ত করে দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ—দেশ তো আজ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সে স্বাধীনতাকে তো শুধু বাইরেই দেখতে পাচ্ছি। অন্তরে একে কবে উপলব্ধি করতে পারব ?

উত্তর ঃ—বাইরের বুঝ যেদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন যদি বোঝা যায়! চিতার আগুনে পুড়ে দেহের আর মনের অণু-পরমাণুগুলো যখন আলোতে, মাটিতে, জলেতে মিলে মিশে এক হয়ে যাবে, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে যখন তারা একাত্ম হয়ে যাবে, তখনই স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝবে। অন্তরে স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে হলে, অন্তরের ও বাইরের—উভয়ের স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমরা শুধু বাইরের স্বাধীনতাই পেয়েছি, অন্তরের স্বাধীনতার কথা শুধু মুখেই বলা হয়—সত্যিকারের পাইনি। তাই এখনকার স্বাধীনতা বুঝতে হলে, ধামাধরা নীতির পথ ধরতে হয়। আর তা যদি না পার, তবে ঐ বিশেষ কয়েকটা দিনেই শুধু মনে হবে—আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যেদিন বাক্সের ভাঁজ করা জাতীয় পতাকাটি দড়ি দিয়ে টেনে উপরে তোলা হয়, কিংবা ছাদে, মাঠে, ঘাটে জাতীয় সঙ্গীতের সুর তোলা হয়, সেদিনটাতেই শুধু আমাদের স্মরণে আসে—'আমরা না স্বাধীনতা পেয়েছি'! তখনই চলতে থাকে ছোট ছোট সভায় বড় বড় বক্তৃতা, বেতার-ভাষণ আর সারাদিনব্যাপী উৎসব। তারপর সে দিনটাও কেটে যায়, আমরাও ভুলে যাই যে আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিকই—কিন্তু আমরা কি পেলাম? দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, সমস্যা আর হাহাকার ছাড়া আর কি পেয়েছে ভারতবাসী? সত্যিই যদি আমরা অন্তরে-বাইরে স্বাধীনতা পেতাম, তবে আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ধারা অন্যরকম হ'ত।—দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা থাকত না। ভিতর ও বাহির, ঘর ও পর, স্বদেশ ও বিদেশ, সব এক হয়ে যেতো! যেদিন ঝাড়ুদার থেকে মিনিষ্টার পর্যন্ত সবাই সবাইকে মনেপ্রাণে এক বলে বুঝতে পারবে, গ্রহণ করবে, সেদিনই স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে পারবে, স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে পারবে। শুধু বাইরের

স্বাধীনতায় এ বুঝ সম্ভব নয়। বেদ বলছে—অন্তরকেও স্বাধীন করতে হবে, আয়ত্তে আনতে হবে। যে তা পেরেছে, অন্তরকে যে জয় করতে পেরেছে, স্ব-অধীনে আনতে পেরেছে, সেই প্রকৃত স্বাধীন, সেই প্রকৃত বীর। সেইরকম বীর, স্বাধীন ব্যক্তিই আবার সবার মধ্যে, কি অন্তরে কি বাইরে, স্বাধীনতার ধারাকে সঞ্চারিত করতে পারে, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে। আজ দেশে সেইরকম ব্যক্তি দুর্লভ। বেশীর ভাগই ধামাধরা। তাই স্বাধীনতা হাতে পেয়েও অন্তরে উপলব্ধি করা যাচ্ছে না।

প্রকৃতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে—স্বাধীনতা কি? সেখানে মুক্ত আকাশে অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্র-তারকা প্রত্যেকেই স্বাধীনতার ঢেউয়ে দুলছে—আপন আপন গতিপথে বিচরণ করছে। কেউ কারুকে বাধা দিচ্ছে না, কেউ কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না।

প্রকৃতির দিকে যদি তাকিয়ে দেখ, যদি তাকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, তবে বুঝতে পারবে—স্বাধীনতা কি? সেখানে মুক্ত আকাশে প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র-তারকা, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীবাণু এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণু প্রত্যেকেই স্বাধীনতার ঢেউয়ে দুলছে। তাদের আপন আপন গতিপথে তারা বিচরণ করে যাচ্ছে। কেউ কারুকে বাধা দিচ্ছে না। কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না। অথচ কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, অনিয়ম নেই, অরাজকতাও নেই; সব কিছু কেমন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

জীবজগতেও প্রতিটি জীব সৃষ্টির দিক থেকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কোনদিক থেকে কোনকিছুর অভাবও হচ্ছে না। প্রকৃতি মুক্তহস্তে, অপর্যাপ্ত পরিমাণে আলো, বাতাস, জল, হাওয়া বিতরণ করে চলেছে। সেখানে প্রকৃতির যেমন কার্পণ্য নেই, তেমনি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও কারুর মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা, মনোমালিন্য, মারামারি-কাটাকাটি নেই। কেউ সেখানে বলছে না—'এতটা সূর্যের আলো আমার', 'এই বর্ষার জলে তুমি ভাগ বসাতে পারবে না', কিংবা, 'ঐ আকাশে-বাতাসে আর কারও অধিকার নেই।'

খাদ্যের মত প্রকৃতির আলো, জল, বাতাসেরও যদি রেশন করা হ'ত, মানুষের হাতে পড়ে তাতেও যদি কণ্ট্রোলের বেড়া দেওয়া হ'ত, তাদের পাওয়ার জন্য যদি সকলকে লাইন দিতে হ'ত, তবে আর দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকতো না!—খাদ্যের বেলায় আজ যা হয়েছে—শুধু সমস্যার পর সমস্যাই বাড়ছে, সুরাহা আর হচ্ছে না। কারণ, মানুষের গড়া নিয়মে ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে। প্রকৃতির নিয়মে কোন ফাঁকি নাই। সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উপব সকলকার সম-অধিকার। জল, আলো. হাওয়া, আকাশ-বাতাসকে উপভোগ করতে এখানে কোন দলাদলির অন্তরায় এসে বাধা দিতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ এসে তাকে কলুষিত করে নি। কোন কিছুই এসে তাদের স্বাধীন গতিকে রোধ করতে পারে নি, আজও পারছে না; কোনদিন পারবে বলেও মনে হয় না। কারণ তারা স্বগতিতে সজাগ ও বলীয়ান। তাই পৃথিবীর গর্ভজাত যারা. তারা পৃথিবীর বুকে থেকেই আত্মহারা। প্রতি মুহূর্তে তারা যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করছে, তেমনি স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করছে।

প্রকৃতির নিয়মে কোন ফাঁকি নেই। সেখানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর উপর সবার সমান অধিকার। জল, আলো, আকাশ-বাতাসকে উপভোগ করতে কোন দলা-দলির অন্তরায় এসে তাদেব স্বাধীন গতিকে রোধ করতে পারেনি।

প্রকৃতির এই যে ভাব, আমাদের মধ্যে তার অভাব বলেই আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েও তাকে উপলব্ধি করতে পারছি না, উপভোগও করতে পারছি না। আজ আমাদের গতির ধারা ভেজাল মিশ্রিত, কলাকৌশলে ভরা, কৃত্রিম; দলাদলি আর সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে পিচ্ছিল। তারই ফলে স্বাধীনতার স্ফুরণ দেশের সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। তা অন্তর ও বাহিরকে আলোকিত করতে পারছে না। ঘরের মাটির প্রদীপের মত খণ্ড আলো বিতরণ করেই তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আজকে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা সমগ্র জনসাধারণকে

আদৌ আলোকিত করতে পারেনি। ক্ষুদ্র মশালের আলোর মত মুহূর্তে জ্বলে উঠে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্থানে সাময়িক আলো দিয়েই নিভে যাচ্ছে। সুতরাং একে আমরা স্বাধীনতা বলব কি করে? তাছাড়া আমরা যে অন্তরে স্বাধীনতা পাই নি, একথাও আমরা আজ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারছি না। নানা আশঙ্কা ও চিন্তা এসে বাধা দিচ্ছে—যদি চাকরি যায়, যদি সরকারের বিষ-নজরে পড়তে হয়; সেই আতঙ্কে সবাই অন্তরে স্বাধীনতা উপলব্ধি না করলেও মুখে বলে যাচ্ছে—আমরা স্বাধীন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—বুকে টোকা দিয়ে বল, সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছ কিনা, কেউ তা বলতে পারবে না। কারণ, সে কথা বললেও বিপদ।

বেদ বলছে—স্বাধীনতা হবে সূর্যের মত সদা-দীপ্তিমান, স্বয়ং-প্রকাশ। তার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে সকল দিক আলোকিত হয়ে উঠবে। সূর্যের আলোককে যেমন সীমাবদ্ধ করা যায় না, স্বাধীনতা হবে তেমনি অসীম, অবারিত। তার বিকাশ, তার প্রকাশ হবে সর্বত্র। ঘরে বাইরে, দেশে বিদেশে, বহির্লোকে অন্তর্লোকে—সর্বত্র তার স্পর্শ যখন ছড়িয়ে পড়বে, তখনই তাকে উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ—আমরা কোন্ কাজটা করব? এখানকার ইন্দ্রিয়গুলোর চাহিদা বুঝি বলেই করে যাচ্ছি। এর পর যে পরিপূর্ণতা—সেটা যে করব, কি নিয়ে করব?

উত্তর ঃ—এখানকার সব কিছু কাজের মূলে অগ্রে কোন্ ভাবটা থাকে? যা কিছু চিন্তার—প্রথম বুঝটাই সব কিছুকে ভাবিয়ে তোলে, নিবৃত্তির মূলে আমাদের বুঝ ও চিন্তাই আগে মিটিয়ে দেবার সহযোগিতা করে। তারপর আমরা সেটাকে ব্যবহারে আনি। ব্যবহারে এনে ব্যবহার করার মুহূর্তেও ভেবে ভেবে স্বাদে সোয়াদে চিন্তার বা মনের ভিতরে নিয়ে ফেলি এবং তারপর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নানা বর্ণনায় সেটাকে তৃপ্তির ধারায় নিয়ে ফেলি। ইন্দ্রিয়ের আহার্যের যা কিছু, এর স্বাদ সোয়াদ

নির্ভর করছে সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি-চিন্তার উপর। ভাবনা তার ভাবনার বস্তুকে ভাবে এনে চরম ভাবনায় পৌঁছে দেয়; আবার সেই ভাবনার বস্তুকে এই ভাবনা দিয়েই বিস্বাদে পরিণত ক'রে ত্যাজ্য করে দেয়। ভিতরে রাখা না-রাখা উভয়ই ভাবনার মূলে। ভাবই টেনে আনে ভাবের বস্তু এবং জিহ্বার মত (কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা অগ্রাহ্য, সে সেটা যেমন ভাল জানে) ভাব ও ভাবনারূপ জিহ্বা তার পছন্দমত কোন্‌টা গ্রহণ করবে, কোন্‌টা বর্জন করবে—সেটা সে জানে ভাল। নদীতে ঝড়ে বিপদে পড়লে, তখন সাজগোজের চিন্তা থাকে না—তখন 'হা ভগবান', 'হা আল্লা' এই থাকে। আল্লা বা ভগবানকে সে দেখেনি, কিন্তু বিপদমুহূর্তে তাঁর চিন্তা ও ভাবনাকে, তাঁর ডাককে আশ্রয় করল—শুনে আসছে 'ভগবানকে ডাকলে রক্ষা করেন'—ঐ বিশ্বাসে। না জেনে, না দেখে ভগবানকে ডাকা শূন্যে হাতড়ানোর মতই; কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, শূন্য থেকেই জীবজগৎ সৃষ্টি। একদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এর মূলে এমন একটি চেতনার প্রভাব রয়েছে যে, সেই সচেতনকে মনেপ্রাণে ডাকলে বা স্মরণ করলে কোন বিহিত হবে না—একথা বলা চলে না, যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকিতে বুঝি। সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে, সৃষ্ট বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী যেখানে যে বিহিত করা দরকার, সেইভাবে set হয়ে আসছে বা set করে যাচ্ছেন। জীব জগৎকে রক্ষা করার কল্পে যে বিহিত করা দরকার, তাও করেছেন। কে করেছেন না-করেছেন সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলছি না। প্রকৃতির থেকে যদি আপনিই হয়ে থাকে, সেটাও কম নয়; সেই 'আপনি'র মধ্যে সম্পূর্ণতা রয়েছে এবং সম্পূর্ণ সজাগই রয়েছে। সেই সচেতনকে স্মরণ করে আমাদের এই ভিতরকার চেতন বস্তুগুলো আপনিই স্মরণ করার

ভাবনাই তার ভাবনার বস্তুকে ভাবে এনে চরম ভাবনায় পৌঁছে দেয়।

সৃষ্টির নিয়ম হ'ল—যার থেকে আসে, তার কাছেই যায়। তাই শূন্যের থেকে যখন এই জগৎ সৃষ্টি, জগতের চিন্তাধারা সেই শূন্যমুখী।

উদ্দেশ্যে স্ফুরিত হয়ে যাচ্ছে। তখন যে যেই ভাষায় আশ্রিত, সেই ভাষা ও শব্দ সামনে নিয়েই রক্ষাকল্পে এগুতে থাকে। এই জগতের পরিপূর্ণতার দিকটা যখন আমরা ভাবি, সেই ভাবনা দিয়েই ওই ভাবকে আমরা ভাবি—এটাই স্বভাব। স্বভাবজাত নিয়মই হ'ল—যার থেকে আসে, তার কাছেই যায়। সেটা এখানকার ভাবনার বস্তুর মতই আর একটি বস্তুর সামিল হয়ে যায়। শূন্যের থেকেই যখন এই জগৎ সৃষ্টি, জগতের চিন্তাধারা সেই শূন্যমুখী। আমাদের এই শূন্যগর্ভ হ'তেই পরিপূর্ণ হয়ে আসছে ও হবে।

প্রশ্ন :—আপনি প্রায়ই বলেন—'কিভাবে চললে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যাবে, প্রকৃতিই তার ইঙ্গিত নানাভাবে, নানা দিক থেকে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা সে ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে সেইভাবে চললে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।'—প্রকৃতি কিভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং আমরাই বা সে ইঙ্গিত বুঝবো কি করে—সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর :—যেভাবে তখনকার মুনি-ঋষিরা বুঝতেন, সেইভাবেই চেষ্টা করে প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝতে হবে। প্রকৃতির নিজস্ব বর্ণমালায় সবকিছু আকাশের পাতায় লেখা আছে। সেটা পড়ে নিতে হবে। সে বর্ণমালার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, সে-ভাষা যে বুঝতে পারে, তার পক্ষে প্রকৃতির ইঙ্গিত, তার ভাষা ধরতে পারা, বুঝতে পারা কিছুই কঠিন নয়। তখনকার দিনের চিন্তাশীলরা প্রথমে এই ভাষাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—জীবজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে প্রয়োজনের দ্বারা যুক্ত। আদান-প্রদানের মধ্যেই জীবজগৎ টিঁকে আছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, বনে-জঙ্গলে, সর্বত্র সবার ভেতরে, সবার সঙ্গে ছিল একটি ভাবের যোগাযোগ।

জীবজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে প্রয়োজনের দ্বারা যুক্ত। আদান-প্রদানের মধ্যেই জীবজগৎ টিকে আছে।

ঐ ভাবটাই ছিল সবার মাতৃভাষা, আর ঐ যোগাযোগটাই হ'ল সবচেয়ে

বড় যোগ। সেই ভাবের যোগের দ্বারাই তারা প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে, একাত্ম হয়ে তার ইঙ্গিত পাঠ করে নিতো। তখন ছিল সকলের সঙ্গে সকলের প্রেম, ভালবাসা, মিত্রতা, আন্তরিকতার সম্পর্ক। কারুর সঙ্গে কারুর দ্বন্দ্ব ছিল না, হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। ভাল-বাসার সম্পর্কে যুক্ত ছিল বলেই একটু চেষ্টা করলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাবের ভাষা বুঝতে পারত। আজও দেখ, পালিত পশু-পাখী, যাদের সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যাদের নিয়ে আমরা একত্রে বাস করি, তাদের ভাব, চাল-চলন বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।—তখন তেমনই ছিল।

সকলের সঙ্গে সকলে ভালবাসার যোগাযোগে যুক্ত ছিল বলেই মুনি-ঋষিরা বুঝেছিলেন, বিশ্বজগতে প্রতিটি জীবের প্রতিটি বস্তুর রূপের পার্থক্য যতই থাক, স্বরূপে সকলে এক, সকলে একই জায়গার অধিবাসী। আবার প্রত্যেক জীবের মধ্যে, বস্তুর মধ্যে রূপে-রঙে পার্থক্য কেন? কেন সুরে, স্বরে, স্বভাবে পার্থক্য—এটাও তাঁরা বুঝে-ছিলেন। এই যে প্রত্যেকের আহারে-বিহারে, আচারে-আচরণে পার্থক্য বা ভিন্নতা, এগুলিই হচ্ছে প্রকৃতির গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণমালা। জানার সুবিধার জন্যই এই তারতম্য। এই বিভিন্ন বর্ণমালাগুলো জানতে পারলে প্রকৃতির প্রকৃত গ্রন্থ পাঠ করা সহজ হবে। তখনকার মুনি-ঋষিরা এগুলিই পাঠ করতেন। আজকালকার বইএর পাতায় বা বিভিন্ন অধ্যায়ে যেমন এক একটি বিষয়-বস্তু লিখিত থাকে, তেমনি প্রকৃতির এক একটি বস্তুই হচ্ছে বেদের এক একটি অধ্যায়; সেই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন তথ্য নিহিত আছে। সুতরাং বেদ কল্পনাপ্রসূতও নয়, অবাস্তবও নয়। সবই প্রকৃতিজাত, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবভিত্তিক।

বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু বেদের এক একটি ভিন্ন অধ্যায়। প্রতি বস্তুতে, ব্যক্তিতে, জীব-জন্তুতে যে পরস্পর পার্থক্য, তা এই বেদের অধ্যায়েরই বিভিন্নতা।

প্রাচীন মনীষীরা ছিলেন বিশ্লেষণমুখী। জীবজগতের প্রত্যে-

কের ভাব, মন, চিন্তা কার মধ্যে কতটা প্রভাবিত হচ্ছে, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে, তাঁরা এক একজন এক একদিকে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা করতে করতে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ—সবকিছু থেকে তাঁরা আকাশের বহু গুণ আবিষ্কার করলেন এবং সে সমস্ত গুণগুলো ধরে রাখলেন। ঐ গুণগুলো বিচার করে, কোন্‌টা কতখানি কোন্‌ কাজে লাগানো যায় পরীক্ষা করে, প্রয়োজনমত সেগুলি ধরে ধরে কাজে লাগাতে লাগলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, অসুখে-বিসুখে ঔষধ খুঁজে বা'র করা অনেক পশু-পাখীর সহজাত গুণ। এটাই প্রকৃতির একটা ভাষা। অনেক পর্যবেক্ষণের পর এই ভাষা যখন তাঁরা আয়ত্ত করলেন, তখন সেই ভাষার সাহায্যে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠে মগ্ন হলেন! তাঁরা হয়তো লক্ষ্য করলেন,—কোন পাখীর পা ভেঙ্গে গেছে, আর একটি পাখী মুখে করে একটি পাতা এনে কোন একটা লতার সাহায্যে সেটা তার পায়ে বেঁধে দিল। কিছুদিন পরই সে সুস্থ হয়ে উঠলো। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পাখীর এই কার্যকলাপ লক্ষ্য করে কী পাতা তারা ব্যবহার করল, কী পাতা তারা বাঁধল, সেগুলি এনে তার দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করে নিজেরা ব্যবহার করে দেখলেন—সত্যিই সুফল দিচ্ছে। এইভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণের দ্বারাই তাঁরা প্রকৃতির পাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, আকাশে সবকিছু আছে। আকাশ নিজেকে পরিচিত করার জন্যই তার অগণিত অঙ্গুলির দ্বারা সব সময় ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—'এইভাবে চল।' প্রকৃতির কোটি কোটি জীব, কোটি কোটি বীজ আকাশের অঙ্গুলি স্বরূপ। সেই অঙ্গুলি যেন কলম ধরে' লিখে জানিয়ে দিচ্ছে—'এইভাবে চল, এইভাবে বল।' প্রকৃতিদত্ত এই নির্দেশই হচ্ছে বেদ। সুতরাং বেদই সবকিছুকে উপলব্ধি করার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে—সকলকে তত্ত্বমুখী করছে।

বেদের তত্ত্ব এবং জীবনের তত্ত্ব একই সুরে বাঁধা, সাধা, গাঁথা।

সুতরাং জীবনকে উন্নত করতে হলে, সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হলে বেদের তত্ত্বকেই প্রয়োগ করতে হবে। বিশ্ব-সমাজ গঠন করতে হলে আকাশের নির্দেশেই চলতে হবে। বীজ গৃহেই আছে। তাকে শুধু ক্ষেত্রে রোপণ কর। আকাশে, প্রকৃতিতে কোন কিছুর অভাব নেই। যখন যা প্রয়োজন—খুঁজে দেখ ঠিক সেখানে পেয়ে যাবে। সেই প্রকৃতির নির্দেশে যদি আজ সকলে চলতে পারত, তবে অসুখ-বিসুখ, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, ছল-চাতুরি, দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক কিছুই থাকত না। হয়তো অভিধানেই কেবল শব্দগুলোর উল্লেখ থাকতো, বাস্তবে কোন প্রয়োগ পাওয়া যেতো না। আজ যেমন 'বেদ কি?'—এ কথা তোমাদের এসে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে হচ্ছে, তেমন ঐসব কথাগুলোর অর্থ কি, এগুলো কাকে বলে, বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে বুঝে আসতে হ'ত। তোমরা যদি একটু চিন্তা কর—প্রকৃতির নীতিটাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই দেখবে, আদর্শ সমাজ গঠন করার জন্য যা কিছু দরকার—নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সব কিছু প্রকৃতির প্রতি বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যে অপূর্ব মিলন, সেই মিলনের ধারায় ধারায়, ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলে সমস্ত সমস্যার সমাধানের দিকটা খুঁজে পাবে। বেদজ্ঞরা সেইভাবে অগ্রসর হয়ে সব কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই নীতিতে তখনকার সমাজ গড়েছিলেন বলেই তখন কোন সমস্যা ছিল না। সমাজ সবদিকে ভরপুর ছিল। সমাজপতিরা দিবারাত্র বিশ্ব-রহস্যের চিন্তায় ও বিশ্লেষণে মগ্ন থাকতেন, তার থেকে খুঁজে বা'র করতেন অমূল্য সম্পদ। সেগুলিকেই বাস্তবের কাজে লাগাতেন।

সমাজকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে বেদের তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে হবে, প্রকৃতির কাছ থেকে নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, সহযোগিতার পাঠ নিতে হবে।

আজও আকাশ তার অগণিত অঙ্গুলির ইসারায় সমস্ত সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। সেই ইঙ্গিত বুঝতে চেষ্টা কর। বেদ-বাণীকে সম্বল করে বিশ্বের জানার পথে এগিয়ে যাও। দেখবে, নিজে যেমন অপূর্ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে, তেমনি সমাজকেও

প্রাণের মত করে গড়তে পারবে। শিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমস্ত কিছুর মূল জিনিস এখানে পেয়ে যাবে। একটা গাছকে লক্ষ্য করে দেখ, সে যেন কবিতা হয়ে ফুটে বা'র হচ্ছে।--সেখানে তুমি কবিতার ছন্দের নির্দেশ পেয়ে যাবে। পাখীর বাসার দিকে তাকাও, সে যেন শিল্প হয়ে উঠেছে।—কারিগরী বিদ্যার ইঙ্গিত সেখানে পাবে। মাটির তলায় ইঁদুর, খরগোস, পিপীলিকা ইত্যাদির গর্ত খননের ধারাটিকে লক্ষ্য করলে বাণিজ্যিক শিক্ষার অপূর্ব পথনির্দেশ মিলে যাবে।—কি অদ্ভুত কৌশলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তারা ভূগর্ভে একস্থান থেকে আর একস্থানে চলে যাওয়ার পথ তৈরী করে রেখেছে! এক জায়গা থেকে খাদ্য এনে আর এক জায়গায় জমা করছে! এসব ভাষা পাঠ করতে পারলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি, আদান-প্রদান, খাদ্য সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবকিছু শিখতে পারা যায়। প্রকৃতি যেন শিখিয়ে দেওয়ার জন্যই সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছে। আমাদের কাজ হলো, সেগুলো বুঝে বুঝে সমাজের কাজে লাগান। বেদজ্ঞরা সেই চেষ্টাই করেছিলেন। আর সেই যুগের সমাজপতিরা সেই নীতিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই তখন কোন অভাব ছিল না। আমি চাই—আবার সেই বেদের যুগের মত প্রকৃতির নীতিতে সমাজ গড়ে উঠুক।

প্রশ্ন ঃ—আমরা তো এখন এই বুঝেই আছি যে, এখানকার ভাবনা যে ঠিকমত ভাববে, সেই ঠিক। এটা ঠিক কিনা—আপনার নিকট জানতে চাই।

উত্তর ঃ—জন্মের সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক; উদয়ের সাথে অস্তের, জোয়ারের সাথে ভাটার, ভোগের সাথে ত্যাগের, 'হ্যাঁ'র সাথে 'না'র এবং 'না'র সাথে 'হ্যাঁ'র সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আলো ছাড়া অন্ধকার নয়—অন্ধকার ছাড়া আলো নয়। দুঃখের সাথে সুখের সম্পর্ক—সুখের সাথে দুঃখের সম্পর্ক। ইহকালের সাথে পরকালের সম্পর্ক,

জন্ম-মৃত্যু, উদয়-অস্ত, জোয়ার-ভাটা, ইহকাল-পরকাল পরস্পর

সম্বন্ধযুক্ত। এক-টিকে বাদ দিলে আর একটির অস্তিত্ব থাকে না।

আবার পরকালের সাথে ইহকালের সম্পর্ক। এখানকার সাথে সেখানকার সম্পর্ক, সেখানকার সাথে এখানকার সম্পর্ক। আবার, শব্দ-বিন্যাস ভাব-বিন্যাস থেকে—ভাব-বিন্যাস শব্দ-বিন্যাস থেকে। শব্দ ও ভাব জল আর বরফের মত—একই বস্তুর দুটো নাম।

পৃথিবী এক, তার থেকে সৃষ্ট বস্তু অনেক। কোন বিষয়বস্তুই সে-ছাড়া নয়। এখানকার সুখ, এখানকার ভোগ যে বলছি—'এখানকার' এই শব্দটি 'সেখানে' না থাকলে এখানে ব্যবহৃত হত না। "এই জীবনই শেষ, এই জীবনই সব কিছু"—আর একটি জীবনের সাথে মিশ্রিত না থাকলে এই কথাটি আসতো না।

বাড়ীর পাশের খাল, বিল বা নদীর জলকে স্পর্শ করলে সাগরকেই স্পর্শ করা হয় সন্দেহ নেই। সাগর আছে বলেই এগুলোর অস্তিত্ব। সন্তান পিতা ছাড়া নয়। সমূহ ইন্দ্রিয়ের গোচরে ও তৃপ্তিতে আছে বলেই ইন্দ্রিয়গুলো সীমাবদ্ধ কাজে সমূহ লিপ্ত থাকে। কিন্তু সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তু এবং যাবতীয় যা-কিছু সীমানায় থেকেই সীমানার বাইরের কথা বলে। সীমানার কথাটাই সীমানার বাইরের কথা।

সব কিছু শব্দ, কথা ও ভাব থেকে এইটুকুনই বুঝতে হবে যে, ভোগ বা উপভোগ বা তৃপ্তি, খুশি বা আনন্দ যা কিছু, এখানে পেলে আর পাওয়ার কিছু থাকবে না—এমন যদি হতো, তবে না-হয় "এখানেই শেষ", "এখানেই সবকিছু"—এটা বলা সাজতো। যেমন, তেষ্টার সময় এক গ্লাস কি দু'গ্লাস জল পান করা হলো। তাতে তেষ্টার যে নিবারণ—তা চিরকালের জন্য নয়। কিছুক্ষণ পরই তাই আবার তেষ্টা—আবার চাই জল। সাগরের জল সবটা পান করলেও তেষ্টা নিবারণ কোনদিনই হবে না। এমনি করে ভেতরের বহুরকম তেষ্টাও বহুমুখী হয়ে আছে। কোনটাই চিরকালের জন্য পূরণ হচ্ছে না। তবে এই ক্ষণিকের আভাসগুলি বিরাটের আভাসেরই

ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস। এই বাস্তবের যে সুখভোগ এবং এখানকার যা কিছু, এটাও নিশ্চয় সেই আভাসেরই একটি আভাস—এটা নিশ্চয়ই বলা চলে।

জন্মটা মৃত্যুরই ইঙ্গিত, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই তার পরিবর্ত্তন আছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই আমরা জন্ম-মৃত্যু সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে উপভোগ করে চলছি। পরিশেষে সব রোগ-শোক-তাপ একত্র হয়েই হয় জীবনাবসান। অবসানের পথে ওগুলো ব্যথারই গান। একটা হাঁচি বা কাশি, একটু সর্দি বা জ্বর—এমনিতে খুব বেশী কিছু নয়। কিন্তু এরাই একত্র হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। গণতি করলে দেখা যাবে, একদিনের একটি হাঁচি বা কাশি মৃত্যুর গণতিতে ঠিকই ছিল। একটি পাইপয়সার এমনিতে কোন মূল্য নেই, কিন্তু ষোল আনা পূরণ করতে হলে তাকে বাদ দিলে চলবে না।

প্রতিটি ভাব, শব্দ ও অর্থ শিশুর স্বভাবজাত কান্নার সুরের মত বের হয়ে আসছে। আবার এক একটি ভাব, শব্দ ও অর্থ আর একটিকে ভর করে বেরিয়ে আসছে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মত। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মত বহু বহু একক একত্র হয়েই একটি বৃহৎ সংখ্যা হয়; বৃহৎ চিন্তা সামান্য চিন্তাগুলো একত্রিত হয়েই হয়।

একই মস্তিষ্ক—তা থেকেই মন, আর তার থেকে কত ভাবনাই না ভেবে আসছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সীমানা থেকেই এর শুরু,—তারই চোট কত! ক্ষুদ্র বীজ-শক্তিই একদিন বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয় আর অজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানেই ঝোলে।

এই বৃহৎ শূন্যময় আকাশে কত অগণিত গ্রহ রয়েছে জানি না, কত মাথা সেই সব গ্রহে রয়েছে জানি না। তবে যার আশ্রয়ে সবাই আশ্রিত, সেটা ফাঁকা হলেও একটা আকার মাঝে নিশ্চয়ই আছে। চৈতন্য ও প্রাণের যে পরিচয় প্রতি বস্তুতে আমরা পাচ্ছি—জীবজগৎ তারই প্রমাণ। যার মাঝে ঐসব অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ বাস করছে, তার শক্তি তাদের চেয়ে বেশী—এটা ভাবতেই হবে। তার মানে, এই

যে ফাঁকা আকাশ—যে আকাশের শেষ নেই—তা থেকে আমাদের আভাস দিয়ে যা বুঝতে পারি, তাতে এইটুকুই বুঝি যে, তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার—কোনটারই শেষ নেই। এই যে আনন্দ, ভালবাসা প্রেম ও সুখ-শান্তির লালসা—যার জন্য সমস্ত জীবজগৎ একমুখী হয়ে এগিয়ে চলছে, সেটা যে-অবলম্বনকেই আশ্রয় করে চলুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

বসন্তের পাখী ও বসন্তের ফুল বসন্তকেই অনুসরণ করে চলছে। পৃথিবীর আলোর গতির সাথে নিজের গতি মিশিয়ে যদি চলা যায়, তবে চিরদিন আলোই পাওয়া যাবে। অন্ধকারের বেলাতেও ঠিক তাই।

পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনের গতি আছে বলেই পরিবর্তন হচ্ছে। যখনই কোন পরিবর্তন হবে তখনই ভাবতে হবে, আর একটা কিছু না থাকলে পরিবর্তন হয় না। এখানকার যা' কিছু, সবই বৃহৎ বস্তুর বিষয়বস্তু দিয়েই গড়া। সাধারণ প্রমাণেই তা প্রমাণিত হয়। এখানকার সুখভোগ এখানেই শেষ—এটাই প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের জীবনে খুঁজতে গেলে কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কে আমি—খুঁজে পাওয়া যায় না; কে দেখে, কে শুনে, কে বোঝে—কোনটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খুঁজে না পাওয়া কার আভাস ?—সেই বৃহৎ মহাশূন্য বা আকাশেরই আভাস পাচ্ছি। আমাদের জীবনের যা কিছু—খুঁজতে গেলে সবটাই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে—কোন কিছুরই শেষ নেই। মহাশূন্যেরও শেষ নেই, আমাদের এখানকার যা-কিছু, তারও শেষ নেই। এই ইহকালই হচ্ছে পরকালের তরী। ভব-সাগর পার হতে হলে এই তরীকেই আশ্রয় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ—আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে মিটবে—আমরা কি ভাবে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে তা মেটাতে পারব ?

উত্তর ঃ—একটা কথা মনে রাখবে—মনোকষ্টে আমরা কাঁদি, হাসি না। যে কোন ব্যথা পেয়ে, আঘাতজনিতই হোক বা রক্তপাতজনিতই হোক, আমরা চীৎকার করি,—তাতে ব্যথার কিছু লাঘব হয় না কি ?

হয় বলেই—কান্নাও রয়েছে, হাসিও রয়েছে। যানবাহন যেখান দিয়ে চলে—গাছ, পাতা, বাড়ী সব ধূলোয় ভরে যায়।—আবার প্রকৃতির ব্যবস্থায়ই ওরা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এতটুকু চক্ষু—তার রক্ষার ব্যবস্থা আছে। কত ধূলো গিয়ে এতে পড়ে! রক্ষা করার কিছু যদি না থাকতো, ধূলোর স্তূপ হয়ে যেত। এসব ধূলো থেকে স্বভাবজাত রক্ষা করার বিষয়বস্তু দ্বারা রক্ষা পেয়ে আসছে। চোখের জলে সে তাকে ধুয়ে নিচ্ছে, antiseptic হিসাবে তাকে রক্ষা করে দিচ্ছে। এরকম বহু antiseptic আমাদের দেহে আছে—প্রকৃতির থেকে আমাদের রক্ষা করিয়ে নিচ্ছে। রক্ষা করা, পালন করা—প্রকৃতিরই নিয়ম। পথ বেছে নেওয়ার বুদ্ধিতেই পথের খোঁজ আসে। অর্থ ও পরমার্থ—এই দুইয়েরই অভাব পূরণ করছে আমাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধিজীবী লোক তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। জীবিকা নির্বাহ শুধু ডাল-ভাত খাওয়াতেই শেষ হয় না, তার ঊর্ধ্বে আরও কিছু খাবার আছে—সেটা সম্পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। মনে যখনই কোন অনুশোচনা আসে, তা বিনা কারণে হয় না। পথে পৌঁছবার জন্যই অনুশোচনা, অনুতাপ। শরীরের চুলকানির সাথে সাথে আমাদের হাত-পা-অঙ্গুলিগুলি সেই ভাবে নড়তে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না চুলকানি দমন করতে পারি, নখ-অস্ত্র ব্যবহার করি। তবেই দেখা যাচ্ছে, এ অস্ত্রগুলো বিশেষ প্রয়োজনেই হয়েছে। প্রয়োজনের সাথে সাথে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যখন প্রকৃতিপ্রদত্ত দান, সেখানে ভাববারই প্রয়োজন হয় না। ভাববার মত ভাবনা যখন তোমার মধ্যে রয়েছে, তখনই ভাবতে হবে—ওটা অঙ্গস্বরূপ। অভাবের মূলেই যে ভাবনা, তাই অভাবগুলো fulfil না হওয়া পর্যন্ত ভাবনার মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলছে। সেই অভাবগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যই এই ভাবনা। সময়মত, সময়ানুযায়ী ঠিক fulfilment হয়ে যাবে। আট বছরের বাচ্চা ষাট বছরের পিতাকে বলছে—"আমার

জীবের প্রয়োজনের সাথে সাথে তা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রকৃতিপ্রদত্ত। তাই তার জন্য ভাববার প্রয়োজন হয় না।

চুল পাকছে না কেন ?"—বলে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। পিতা তাকে বললেন—"আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখছ, সময়মত তোমারও পাকবে, তাই অযথা কেঁদে তোমার লাভ নেই।" পূর্বজন্মের ফলে বা প্রারব্ধে কি করেছ, কি ছিলে—সে সব কথা বলতে আমি নারাজ। এখনকার অবস্থা নিয়ে তোমার সাথে আমার কথা। এখানকার যে অভাব পূর্ণ করতে চাইছ, সেই রাস্তার কথাই আমি বলছি।—সেই রাস্তা তোমার কাছেই। সেই রাস্তার উপর আস্থা স্থাপন কর—সেটা কল্পনারাজ্য নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। তুমি যে-শান্তির কামনা করছ, যে-তৃপ্তির সন্ধানে আমার কাছে এসেছ, সেই তৃপ্তির ভাণ্ডার তোমার ভেতরে রয়েছে। এখানকার সব কিছু বিষয়বস্তুকে তৃপ্তির মূলাধারে ফেলে দাও। ব্যায়ামে যেমন বাহুবল এবং মনোবল হয়, "তৃপ্তিতে আছো"—এই ব্যায়ামটা সদা-সর্বদা তোমার ভাবনার মধ্যে এনে রাখ। কথাটা শুনতে এখন ভাল লাগবে না, কিন্তু অভ্যাসে পরিণত কর,—দেখতে পাবে, জীবনে যা কিছু আসছে-যাচ্ছে—সবই একটি পরিতৃপ্তির তৃপ্তি। এইভাবে কিছুদিন চলার পর conception-এর (উপলব্ধির) দরজাটা খুলে যাবে। তখন আপনিই প্রতিবস্তুতে সচেতন হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির ভেতরকার উদ্দেশ্যটা clear হয়ে যাবে। তারপর এখানে যে-কোন ঘটনার সম্মুখীন হবে, তার ভেতরকার তত্ত্ব, রহস্য এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। বুঝের মধ্যে এলেই তখন অঙ্ক মিলে যাওয়ার মত ভাল লাগবে। প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে মিলে যাওয়ার success-টা তোমায় মুগ্ধ করে ফেলবে। এই মুগ্ধ হওয়ার প্রতি মুহূর্তে যে একটা নেশা, সেটাই হবে সব চেয়ে বড় নেশা। এই মুগ্ধ অবস্থাটা তৃপ্তিরই আর এক অবস্থা। এই Universe-এর (বিশ্বজগতের) mathematical calculation-টা (যথাযথ গণনা) তখন তোমার

'তৃপ্তিতে আছো'—নিয়মিত এইচিন্তার ব্যায়াম করতে পারলে একদিন দেখতে পাবে, জীবনে যা কিছু আসছে-যাচ্ছে, সবই একটি পরিতৃপ্তির তৃপ্তি। সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সেদিনই বুঝতে পারবে।

নখদর্পণে এসে পড়বে। প্রতি মুহূর্তে এই মিলানোর পথই হবে শ্রেষ্ঠ পথ। জীবজাতি প্রতি মুহূর্তে এই calculation-এই (গণনায়) গোল পাকাচ্ছে, মিলে না বলেই হা-হুতাশ করছে, আবার সম্পূর্ণ মিলতির মধ্যে থেকেও তারা গলতি করছে। এই গণিতের গণনার ভুলেই যত ভীমরতি। আজকে তোমার যে ভীমরতি—গণনার ভ্রান্তিতে। গণিত তোমার হাতে, গণনা তোমার হাতে, গুণতে যাতে ভুল না হয় তার চেষ্টা কর। প্রকৃতির নিয়মই হলো—যাতে গুণতিতে মিলতি হয়। তাই তোমার ভাবনার ভাগাভাগিতে না গিয়ে, যোগ কর।—এই যোগই হলো যোগ; শাস্ত্রের যে যোগ—এই একই কথা।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যে যা করছে, প্রয়োজনের তাগিদেই করছে এবং করিয়ে নিচ্ছে; —কিন্তু আমরা মনে করি—আমরা করছি। বন্য জন্তুদের যখন তেষ্টা পায়,—তাদের শিখিয়ে দিতে হয় না,—তার টানেই তাদের হাত-পাগুলো সেইভাবে টেনে নিয়ে তেষ্টার বস্তুর কাছে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তির নিবৃত্তার্থে যার যার জ্ঞান-বুদ্ধি সেইভাবেই চালিত হয়। এখানকার ইন্দ্রিযাদির নিবৃত্তিগুলো যেমন সাময়িকভাবে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী মিটিয়ে নিচ্ছে, এই মিটিয়ে নেওয়ার বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতিগত ও শাশ্বত। তেমনি চিরন্তন পরিপূর্ণতার জন্য এই বাহ্যবৃত্তি হ'তেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে আপন সুরে, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলো ভরপুর হবে। যেমনি করে সাময়িক নিবৃত্তিগুলো হচ্ছে,—এটা তারই ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত। দেহে যা কিছু উদ্ভব হবে, তারই প্রতিবিধানের বিধান রয়েছে।—এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং ভাব ও ভাবনা থাকবে, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে—এরাই অবলম্বন স্বরূপ নিয়ে যাবে সেই পরিপূর্ণতার পথে। শুধু পেনডুলামটি দেখলে ঘড়ির সময় দেখা হয় না, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানোর মূলে ওই পেনডুলামটি। আমাদের এই আশা-আকাঙ্ক্ষারূপ

আমাদের ভাব-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা—এগুলোই অবলম্বন স্বরূপ নিয়ে যাবে পরিপূর্ণতার দিকে।

পেনডুলামটি নিয়ে যাবে সেই নির্দিষ্টতার দিকে। Automatically (স্বয়ংক্রিয়ভাবে) এইভাবেই সবদিক চলেছে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যেভাবে বললেন, তাতে মনে হ'ল যে, আপনা-আপনিই টেনে নেবে, কারও কিছু করতে হবে না। এটাই কি ঠিক?

উত্তর ঃ—একদিকে ঠিক। সেটা হলো—স্রোতের মুখে ছেড়ে দিলে স্রোতের টানে সে চলবেই; তাতে আবার পাল তুলে দিলে আরও একটু বেশী চলবে; তার উপর দাঁড় টানলে আরও একটু জোর বেশী হবে। গতির সাথে হাত মিলিয়ে গতির মাত্রা বাড়িয়ে গেলে পৌঁছানোর দিকটা একটু তাড়াতাড়ি হবে। তা না হ'লে একটু সময় লাগতেই পারে। তবে গতির নিয়মে, আজ হোক কাল হোক, পৌঁছবেই। একটা হোল—কালের প্রতীক্ষায় থাকা, আরেকটা দিক হোল—সেটাকে এগিয়ে আনার চেষ্টা।

গতির নিয়মে আজ হোক, কাল হোক, গন্তব্যে পৌঁছবেই। তবে গতির সাথে হাত মিলিয়ে গতির মাত্রা বাড়িয়ে গেলে পৌছানটা তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশ্ন ঃ—সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্তরায়গুলো কি এবং কোথায়? কিভাবে সেগুলি দূর করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায়?

উত্তর ঃ—ধর্মের নামে, শিক্ষার নামে, রাজনীতির নামে আজ যে অঘটনগুলো ঘটে চলেছে, সেগুলিই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়, বেদবাণী প্রচারের বাধা। সত্য আজ এত বিকৃত যে, প্রকৃত সত্যকে আর কেউ চিনতে পারছে না, গ্রহণ করতেও পারছে না। সত্যের বিকৃত রূপই মূল সত্য প্রতিষ্ঠার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মিথ্যা আজ প্রতিটি মানুষের মনের ভিতরে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, তাকে সমূলে উৎপাটিত করে নতুন করে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম আর কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন। ধর্মের বিকৃত রূপটা আজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, প্রকৃত রূপটা আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। খাঁটি কথা বলতে গেলে

সমাজে ধর্মের নামে, শিক্ষার নামে, রাজনীতির নামে যে বিকৃত সত্য প্রচলিত, সেটাই বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

সবাই বিরূপ হয়, বৈরী ভাবে। ভারতবাসী এমনই সরল, নিরীহ ভাল মানুষ যে, কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়—সেটাও বোঝে না ; প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা। তাই ঘুঘুগুলো বাসা বাঁধতে সুবিধা পেয়েছে। এবার ঘুঘুর বাসায় হানা দেবার দিন এসেছে। সে কাজটা ঠিকমত করতে পারলেই বাধা অনেক দূর হবে।

বেদবাণী প্রচার করতে হ'লে, বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে প্রথম কাজ হচ্ছে—বর্তমানে ধর্মের নামে সমাজে কি চলছে, মুখোস খুলে তা সকলের সামনে তুলে ধরা। দ্বিতীয় কাজ হলো—একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্তে ধর্ম কিভাবে বিকৃত হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে তা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া। তৃতীয় কাজ হলো—যখন সকলে বুঝবে আসল সত্য কি, তখন সকলকে নিয়ে সেই চক্রান্তকারী ঘুঘুর ঘাঁটি-গুলোতে হানা দিয়ে তাদের ভিটেছাড়া করা।

এসব কথা আমি অনেকবার, অনেক প্রসঙ্গেই বলেছি। তা সত্ত্বেও বার বার সকলকে জানিয়ে দিতে চাই, ধর্মের নামে আজ কিরকম অদ্ভুত উপায়ে ব্যবসা চলেছে। ছেলেধরারা যেমন ভাল ভাল ছেলে ধরে নিয়ে তাদের অন্ধ, পঙ্গু করে তাদেরই দিয়ে পয়সা রোজগার করে, ঠিক তেমনি বেদের মূল অর্থকে দুমড়ে মুচড়ে, ধর্মের সত্যরূপকে পঙ্গু করে একশ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা চালাতে লাগল। ছেলেধরার মত এদিক ওদিক থেকে একে ওকে ধরে এনে জোর করে মাথা মুড়িয়ে, ফোঁটা তিলক কেটে সাধু, গুরু, অবতার, মাতাজী, বাবাজী, উপাধিতে ভূষিত করল। হাতে তুলে দিল ভিক্ষার ঝুলি। স্থানে স্থানে ঘাঁটি করে তাকেই 'আশ্রম', 'মন্দির' ইত্যাদি নাম দিল। তারপর সেই উপাধি-ধারীদের সেখানে বসিয়ে তাদের দ্বারাই বেদের অপব্যাখ্যা শুরু করল। সেই বিকৃত অর্থ করেই গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করা হলো। এইভাবে শুরু হলো বিকৃত শাস্ত্রের প্রচার। বাড়ীর খাঁটি-ঘিয়েভাজার থেকে রাস্তার ভেজাল মিশ্রিত তেলেভাজার

ধর্মের সত্যরূপকে বিকৃত করে 'ছেলেধরা'র মত এক শ্রেণীর হীন, স্বার্থপর ধর্মব্য-বসায়ীরা ব্যবসা চালাচ্ছে।

মচ্‌মচানি সহজেই সকলকে আকর্ষণ করে। সবাই সেদিকে ঝুঁকে পড়ল। এইভাবেই মূল সত্য আজ মিথ্যার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। বেদের নাম করে তথাকথিত মহাজনরা শিক্ষা দিতে শুরু করলেন—এটা আমাদের আশ্রম, এটা আমাদের সম্প্রদায়, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ, ওটাতে তোমাদের অধিকার নেই ইত্যাদি। তার থেকেই জাগল ভেদবুদ্ধি, শুরু হলো সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি। আদি বেদে 'আমার' 'তোমার' বলে কিছু ছিল না। সব কিছুই ছিল 'আমাদের'—সকল বস্তুর উপর ছিল সকলের সম অধিকার। কিন্তু সেই তেলেভাজার প্রভাবে আর প্রচারে ক্রমশঃই সংস্কার আর কুসংস্কারের বেড়া সকলকে বেড় দিয়ে চলল। মূল বেদ তার তলায় হারিয়ে গেল। ধর্মের নামে আজ যা চলছে, তা সেই বিকৃত শাস্ত্রেরই ফলশ্রুতি। যেমন ধর, চিঠিতে যদি লেখা থাকে 'তুম্‌হারা পিতাজী আজমীর গিয়া', আর তার ব্যাখ্যা করা হয় 'তুম্‌হারা পিতাজী আজ মর গিয়া'—তবে যেমন একটা অনর্থের সৃষ্টি হয়, আজ তেমনি সর্বত্র অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। বেদের মূল সুরের মিড়গুলোকে 'মড়া' বানিয়ে তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীরা আজ সমাজকে মেরে ফেলেছে। তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাও আজ লুপ্ত। সংস্কারের পিঞ্জরে থেকে থেকে ডানা তার এত ভারি হয়ে গেছে যে, মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিলেও সে আর উড়তে পারছে না।

যেখানে খাওয়া, পরা, শিক্ষা, দীক্ষা কোন কিছুরই অভাব ছিল না, সম্পূর্ণ বেদগত-মন হয়ে, বেদের সাম্যনীতির উপর দাঁড়িয়ে বেদের বিশ্লেষণ করতে করতে এক একজন এক এক দিকে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছিল, সেখানে এই দুষমনরা, তাদের বেদের উপর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে দিল। জনসাধারণ বুঝতেই পারল না, কত বড় ক্ষতি তাদের হয়ে গেল। বৃটিশের এতবড় গৌরবের টাইটানিক জাহাজ যখন জলের তলে চলে যাচ্ছে, তখন যেমন তারা বুঝতে পারে নি—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারেনি, তেমনিই অবস্থা হয়েছে আমাদের।

বেদে ভগবান বা দেবদেবীর কথা কিছু বলা নেই।

সমাজ যে আজ ধীরে ধীরে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, একথা আমরা তখন কেন, এখন এই শেষ মুহূর্তেও বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ, বেদজ্ঞ মুনি-ঋষি ব্যক্তিরা তখনই বুঝেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন ঘটতে পারে। সেদিক চিন্তা করেই তাঁরা সমাধানের বিধানও দিয়ে গিয়েছিলেন। সে বিধান বুঝে সেইভাবে কাজ করতে পারলেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়গুলো দূর হতে পারে।

বেদের বিভিন্ন শ্লোক, বিভিন্ন মন্ত্র, বিভিন্ন মূর্তি, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের রূপকে যদি আমরা তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব, তাদের রচনা ও পরিকল্পনার পেছনে বেদজ্ঞ ঋষিদের দূরদর্শিতা ও তৎকালীন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাই কাজ করছে। তাঁরা যা কিছু বলেছেন, যা কিছু লিখেছেন, যা কিছু করেছেন, সব কিছুই তাঁদের জীবনের 'অভিজ্ঞতা'র উপর ভিত্তি করেই করেছেন। যেমন ধর, বেদের অনেক শ্লোকেই সূর্য, বরুণ, পবন, বসুমতী প্রভৃতির রূপ-গুণবর্ণনা করে বলা হয়েছে—এরাই জাতির ও জীবনের উন্নতির মূল। সুতরাং নিজেদের হিত যদি চাও, তবে এদের শরণাপন্ন হও। কেন এঁরা একথা বললেন? তখন দেশ কৃষিপ্রধান ছিল। আলো, বাতাস, জল, মাটি কৃষির প্রধান উপায়। সুতরাং এ বস্তুগুলির শরণ নাও, ক্ষেতের যত্ন নাও, সেচের উন্নতি কর। আলো-বাতাসকে যথাযথভাবে কাজে লাগাও। তবেই কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে, দেশ ধনধান্যে ভরে উঠবে—কোন অভাব থাকবে না।

বেদের আমলে দেশ কৃষিপ্রধান ছিল। তাই কৃষির প্রধান উপায় আলো-জল-মাটি-বাতাসরূপ সূর্য-বরুণ-পবন-বসুমতীকে বেদে বার বার স্মরণ করা হয়েছে।

বেদে অন্নগ্রহণের সময় পঞ্চদেবতাকে স্মরণ করে আচমন করার যে বিধি দেওয়া হয়েছে, তার পেছনেও এই পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—যাদের বিভিন্ন রূপের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের খাদ্য, দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদি পাচ্ছি, তাদেরই স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করলে দেখব—সেখানে

ভগবান বলেও কিছু বলা হয়নি, দেবদেবী বলেও কিছু বলা হয়নি। বরং তাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা, ভবিষ্যৎ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

এই যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি,—তাদের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন রং, বিভিন্ন পরিকল্পনা—এগুলো তবে কেন হলো? মন্ত্রদ্রষ্টারা যে চিন্তা থেকে শ্লোক রচনা করেছেন, শিল্পী-ভাস্কর—এঁরা আবার ঠিক সেই চিন্তা থেকেই ছবি এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন। মনের ভাবনা, চিন্তা, ধ্যানধারণাকেই কেউ কেউ লেখায় প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ চিত্রে প্রকাশ করেছেন, কেউ আবার মূর্তিতে প্রকাশ করেছেন। যে যেভাবে পেরেছেন—রঙে, রেখায়, পাথরে, ধাতুতে, বিভিন্ন শিল্পকলায় নিজেদের অতীতের অভিজ্ঞতাকে, বর্তমানের চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কল্পনা যে একেবারেই ছিল না, তা নয়; কিন্তু যেটুকু ছিল, তা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও দূরদর্শিতার উপরই ভিত্তি করে ছিল। নিছক কল্পনার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুই রচিত হয়নি। এগুলি হচ্ছে সব মানচিত্রের মত। মানচিত্রটাই তো আর সত্যিকারের বিশ্ব নয়, আবার সে চিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি আছে, সৌর জগতে কোথায় কি আছে, ভূপৃষ্ঠে কি কি আছে, ভূগর্ভে কি কি আছে—এগুলি সম্বন্ধে যাঁদের ভালভাবে জানা আছে, তাঁরাই তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, কল্পনা করে এই মানচিত্রগুলি এঁকেছেন। সেই মানচিত্র দেখলেই বিশ্বের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায়, যার জন্য মানচিত্র দেখিয়ে দেখিয়েই বিদ্যার্থীদের ভূ-বিদ্যা শেখান হয়। ঠিক সেই রকম এই মূর্তিগুলি। এগুলি 'স্টাডি' করলেই তখনকার সমাজজীবন, ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, অধ্যাত্মনীতি—সব নীতির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথম মূর্তি তৈরীর পেছনে দেবদেবী, ভগবান,

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের চিন্তার শিল্পরূপ হল দেব দেবীর মূর্তি। এগুলি তৎকালীন সমাজ-জীবনের মানচিত্র স্বরূপ।

পূজা-পার্বণ ইত্যাদির নামগন্ধও ছিল না। সেগুলো সব পরে আরোপিত হয়েছে ঐ ধর্মব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাদেরই দ্বারা। শিল্প একদিকে ছিল জীবনদর্শনের প্রকাশ ও বিশ্বরহস্যের মানচিত্র, অন্যদিকে ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটা উপায়। বেদের আমলে শিল্প ও শিল্পী—কথা দু'টি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হোত। সমস্ত রকম কর্মকেই শিল্প বলে গণ্য করা হোত। কর্মীদের শিল্পীর স্থান দেওয়া হোত। শ্রম ও শ্রমিককে সকলে শ্রদ্ধা করত এবং উপযুক্ত মর্যাদা দিত। শ্রমজীবীরাই ছিল সমাজের খুঁটি। সূর্য, আলো, বাতাস না হলে যেমন কিছুই বাঁচতে পারে না, সেরকম শ্রম বিনা সমাজ বাঁচতে পারে না। বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে যেমন মহাসাগর, কণা কণা শ্রমিকশক্তি নিয়ে তেমনি সমাজ। সেজন্য সমাজের কর্মীদের, শ্রমজীবীদের ছিল শীর্ষস্থান।

বেদের আমলে সমাজে কর্মীদের ---শ্রমজীবীদের শীর্ষস্থান ছিল।

তখনকার মুদ্রাতেও 'হাল হাতে কর্মীদের' ছাপ থাকত,—কোন রাজারও নয় বা নেতারও নয়। আজকের সমাজে মালিকদের সম্মান দেওয়া হ'চ্ছে, শ্রমিকদের নয়। রাজা-বাদশার সমাদর হ'চ্ছে, আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সাধের রাজপ্রাসাদ গড়ল, তাদের কেউ চিনল না। বেদের যুগে তেমন ছিল না; শ্রমের মর্যাদা, কর্মের মর্যাদা সব সময় দেওয়া হোত। এখন যেমন Industrial Festival হয়, সে রকম তখনকার দিনে শিল্পীদের, ব্যাপক অর্থে কর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিল্প-প্রতিযোগিতা হোত।—সেখানে বিভিন্ন শিল্পী। কেউ মূর্তি, কেউ চিত্র, কেউ স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে আসত। আবার অনেকে রকমারী খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে আনত—সেখানেও তৈরী করত। এই শিল্পমেলার কথা মনে করেই সকল শ্রমজীবী সারা বছর ধরে চেষ্টা করত—কে কত ভাল, কত বেশী শস্য, ফসল, ফুল, ফল, তরিতরকারি, শাকসব্জি, বস্ত্র-অলঙ্কার ইত্যাদি তৈরী করতে পারে। নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী সকলেই সারা বছর ধরে সাধনা করে আবিষ্কার করত বিভিন্ন নৃত্যকৌশল, সৃষ্টি করত সঙ্গীতের সুর, তৈরী করত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। তারপর তারা তাদের শিল্প-

কীর্তির সম্ভার সাজিয়ে নিয়ে আসত শিল্পমেলায়—আনন্দমেলায়। সেখানে প্রতিযোগিতাই আসল উদ্দেশ্য ছিল না। সেটা শুধু হোত উৎসাহ দেওয়ার জন্য। শিল্পমেলাগুলিকে কেন্দ্র করে হোত একটা মিলন মেলা—মিলন উৎসব। সেখানে পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিভাবে ভাল জিনিস ও বেশী জিনিস উৎপাদন করা যায়, তারই আলাপ আলোচনা হোত। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখে নিত। সবার ভেতরে ছিল একটা সম-সুর—মিলনের সুর।

শ্রমজীবীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি-শিল্পকেও উৎসাহ দেওয়া হোত। মূর্তিগুলোকে তখন তারা মূর্তি হিসাবে, পুতুল হিসাবেই ভালবাসত। ঘরে ঘরে অনেকেই ভাল ভাল মূর্তি শিল্প হিসাবেই নিয়ে রাখত। আজকাল যেমন শিল্প-অনুরাগীরা বিভিন্ন মূর্তি বা চিত্র সমাদর করে ঘরে নিয়ে যায়, ঘর সাজায় কিংবা মিউজিয়ম করে, তেমনি তখনকার দিনে শিল্পীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, শিল্পের উন্নতি ও উৎপাদন বাড়াবার জন্য, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এগুলো ঘরে তোলা হোত। বলতে পারো—অনুষ্ঠান কেন হোত? ধর দুই দলের মধ্যে কোন খেলা হচ্ছে। এমনি এমনি খেললে খেলাটা একরকম হবে, আর ব্যাণ্ড বাজিয়ে, ইউনিফর্ম পরে, পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করে খেললে খেলোয়াড়দের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়, ফলে খেলাটিও অনেক ভাল হয়। অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ঐখানেই—কোন কিছুকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য উৎসাহ দেওয়া। তখনও অনুষ্ঠানগুলো সেইজন্যই করা হোত। হয়তো জাঁকজমক করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুইটি মূর্তির বিবাহই দেওয়া হ'ল। আবার হয়তো কখনও যে মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে, তাকে ধূপ, দীপ ফুল, চন্দনে ভূষিত করা হ'ল, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে শিল্পীকে বরণ করা হ'ল, সম্মান জানানো হ'ল; কখনও হয়তো সেই উপলক্ষে

বিভিন্ন মূর্তি মূর্তি-শিল্প হিসাবেই সমাদর পেত—দেবদেবীর প্রচলন ছিল না।

কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হ'ল।—সব কিছুই শিল্পীর উৎসাহের জন্য, শিল্পের উন্নতির জন্য।

সেই যে স্বার্থান্বেষীরা—যাদের কথা আগে বলেছি, তারা এ সুযোগ ছাড়ল না। তারা করল কি? এসব মূর্তিকে পূজা করতে আরম্ভ করল।

কালে স্বার্থান্বেষীরা সেইসব মূর্তিকে দেবদেবী আখ্যা দিয়ে তাদের পূজার বিধি-ব্যবস্থা চালু করে।

মূর্তিগুলির এবং বেদগানগুলির অপব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে বোঝাতে লাগল—এগুলিই হ'চ্ছে ভগবানের প্রতিরূপ; বেদজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি-ঋষিরা ধ্যান করে এ মূর্তিগুলি পেয়েছে, এদেরই শক্তিতে জগৎ চলছে। অতএব এই মূর্তিগুলিকে বিভিন্ন উপচারে পূজা করলে, তাদের ধ্যান করলে ভগবান খুশী হবেন। সুতরাং নিজেদের মঙ্গল যদি চাও, এখানে পূজা দাও, যাগযজ্ঞ কর। পাপমুক্ত হ'তে যদি চাও, তবে এখানেই শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা কর। এইভাবে ভাবের কথা বলে লোক আকৃষ্ট করতে লাগল আর নিজেদের ব্যবসা চালাতে লাগল। ক্লোরোফর্ম দিয়ে গৃহস্থকে অজ্ঞান করে দিয়ে যেমন তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়, তেমনি জনসাধারণের সহজ, সরল সুপ্ত মনের ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে এরা তাদের ভাবের কথার ক্লোরোফর্মে এমনই মোহগ্রস্ত করে রেখেছে যে তাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি আর নেই। তাদের বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা সব কিছু হরণ করে নেওয়া হয়েছে। এখন তাদের যা বোঝান হ'চ্ছে, তাই তারা বুঝছে আর সেইমত কাজ করে চলেছে। প্রশ্ন করতে পার—বেদজ্ঞরাও তো তবে তাদের আসল কথাটা বোঝাতে পারতেন। সে চেষ্টা যে তাঁরা করেননি, তা নয়। কিন্তু তাঁরা দেখলেন, তত্ত্বের চেয়ে ভাবের কথায় সহজেই সকলে আকৃষ্ট হয়, সাধারণের বেশীর ভাগই ভাবগ্রস্ত হয়ে সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে। তত্ত্বের কথা আর কেউ শুনতে চায় না। ভাবগ্রস্ত থেকে ক্রমশঃই তারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। সে ব্যাধি ছড়াতে ছড়াতে আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেই ভাবের কথার নেশাতেই সৃষ্টি হ'ল বর্ণভেদ, জাতিভেদ, সম্প্রদায়

ভেদ ; শেষ পর্যন্ত ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানি, এমনকি দেশভাগ পর্যন্ত। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগল বেদের সাম্যবাদের ভিত্তি। এগুলো তো সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অন্তরায়। এর থেকেই সৃষ্টি হ'ল আরও কত অন্তরায়, কত বাধা, কত বিপত্তি! যত সংস্কার, তত বাধা। বেদজ্ঞরা দেখলেন—আর তো উপায় নেই! বিষবৃক্ষের বিষ ছড়াতে ছড়াতে রক্তে গিয়ে মিশেছে। সমাজ তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেমন করে হোক একে উদ্ধার করতেই হবে। উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করেই একটু কৌশল করলেন। তাঁরা দেখলেন—এখন সকলেই মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকছে, আশ্রম-মন্দির-তীর্থের নেশায় মেতে উঠেছে, কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা তো ভাল কথা শুনতেই চাইবে না। তার ওপর, যা বলা হবে, তারই একটা বিপরীত অর্থ করে তাদের বোঝান হবে। শিব গড়তে গিয়ে চক্রান্ত-কারীদের চক্রান্তে হয়ে যাবে তা বাঁদর। স্রোতের বিপরীতে চললে আরও অন্তরায় সৃষ্টি হবে, সুতরাং স্রোতের গতি যে দিকে, সেদিক দিয়ে যাওয়াই ভালো। হয়তো একটু বেশী সময় লাগবে ; কিন্তু নাড়ীর গতি বুঝেই কাজ করতে হবে। যে মূর্তিকে তারা দেবতা-ভগবান বলে বিশ্বাস করে, সেই মূর্তিকে দিয়েই জনগণকে জাগাতে হবে। যে মূর্তিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পত্তন করেছে, সেই মূর্তিকে দিয়েই তাদের সায়েস্তা করতে হবে। তাঁরা নতুন করে বিভিন্ন মূর্তির ধ্যানমন্ত্র রচনা করতে লাগলেন। তাঁদের ধ্যানের মূর্তির হাতে দিলেন অস্ত্র। ত্রিনয়নে দিলেন অগ্নি। মন্ত্র রচনা করলেন—"যুগে যুগে ভগবান দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্যই অস্ত্র হাতে আবির্ভূত হন।" তাঁদের সেই ধ্যানরূপকে শিল্পী, ভাস্কর আবার চিত্রের মধ্যে, মূর্তির মধ্যে নতুন করে রূপ দিল। তারা তৈরী করল শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদির মূর্তি। কারুর হাতে দিল ত্রিশূল, কারুর হাতে

বেদজ্ঞরা সমাজকে রক্ষার জন্য সমাজের নাড়ীর গতি বুঝে মূর্তি-কেই আশ্রয় করলেন এবং তাদের হাতের বিভিন্ন অস্ত্র ও মন্ত্রের সৃষ্টি করে জনগণকে জাগাতে চাইলেন।

তরোয়াল, কারুর হাতে দিল খড়্গ ; কারোর হাতে ধনুর্বাণ, কারোর হাতে চক্র, কারোর হাতে গদা। কেউ রক্তবর্ণ, কেউ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কেউ অগ্নির মত দীপ্ত, কেউ রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর। কেউ দশপ্রহরণধারিণী হয়ে অসুর দমন করছে, কেউ আবার ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করে রক্তপান করছে। এ সব মূর্তি দেখে আবার তাদের ধ্যানমন্ত্র, জাগার মন্ত্র রচিত হ'ল—'তুমিই স্রষ্টা, তুমিই ভগবান। জীবকল্যাণে, মানব কল্যাণে তোমার এক হাতে বরাভয়, অপর হাতে অস্ত্র। তুমি জাগ— অন্যায়কে উচ্ছেদ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর; দুষ্ট দমন করে শিষ্টকে পালন কর; অসাধুকে বিনাশ করে সাধুকে রক্ষা কর।'

অর্থাৎ তখনকার সৃষ্ট শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে সমাজকে, জাতিকে, জনগণকে শয়তানের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, তারই ইঙ্গিত দিয়ে যাওয়া হ'ল। সকল কিছুর মধ্যেই রইল সমাজ চেতনার ইঙ্গিত। তখনকার চিত্রকররা যত চিত্র আঁকল, সবকিছুর মধ্যে অসুরদমনের ইঙ্গিত। বেদস্তুবা যত বেদগান রচনা করলেন, যত শ্লোক লেখা হ'ল, সব কিছুর মধ্যে সেই এক কথা—স্বার্থান্বেষী শোষকশ্রেণীর চক্রান্তে সমাজ যখন রসাতলে যাবার উপক্রম, তখন তোমাদের অস্ত্র ধরতে হবে; শত্রুকে বলি দিয়ে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে।

আগেই বলেছি, এ ধরণের মূর্তি তৈরীর পেছনে, মন্ত্র বা শ্লোক রচনার পেছনে তখনকার দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা বুঝলেন, এদের উদ্ধার করতে হ'লে, যে সংস্কারের জালে তারা আবদ্ধ, সেই সংস্কারের জালেই তাদের ছেঁকে তুলতে হবে। তাঁরা বুঝলেন, যে মূর্তি ও মন্ত্র তাঁরা রচনা করেছেন, ব্যবসায়ীরা সেগুলো ঠিক তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাবে, আর নিজেরাই সেগুলি বহন করে নিয়ে যাবে জনগণের কাছে। আজ জনগণ বুঝতে পারছে না, কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, একদিন

জনগণ যেদিন জাগবে, সেদিন তারা মূর্তির অর্থ বুঝতে পারবে এবং মূর্তির হাতের অস্ত্র নিজেদের হাতে তুলে নেবে।

তারা জাগবেই, বুঝবেই। মূর্তির ভাষা তখন তাদের পড়তে অসুবিধা হবে না ; সে ভাষা বুঝে তারা মূর্তির হাত থেকে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেবে।

বেদজ্ঞদের উদ্দেশ্য সফল হ'ল। তথাকথিত নামধারী গুরু, মহান, অবতারেরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল, যখন দেখল—বেদজ্ঞরা পৌত্তলিকতা মেনে নিয়েছেন, মূর্তিপূজা স্বীকার করেছেন, এমন কি এ সব মূর্তির পূজার মন্ত্র, ধ্যানের মন্ত্রও তাঁরা রচনা করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের আর পায় কে? মনের সুখে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের পাতান ব্যবসা আরও পাকাপাকি করে তুলল। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠলো। তারা বুঝতেও পারল না, নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করছে ; যে পত্র তারা বহন করে নিয়ে চলেছে, তার মধ্যেই তাদের মুণ্ডচ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। সে পত্র যেদিন পাঠ করতে পারবে, সেদিনই মহাবীররূপী জনশক্তি তাদের মস্তক ধূলায় লুটিয়ে দেবে ; মহাবীরের হাতেই রাবণের বিনাশ হবে। সেই যে রূপকথার গল্পে আছে—শত্রুর পরাক্রমে রাজ্য ছারখার। রাজা শত্রুকে কিছুতেই বিনাশ করতে পারছেন না। তখন তিনি শত্রুকে বন্ধু বলে মেনে নিলেন, তার বশ্যতা স্বীকার করলেন। তারপর তারই হাতে এক পত্র দিয়ে বলে দিলেন,—'তোমাকে অমুক রাজ্য দেওয়া হ'ল। এ পত্র নিয়ে তুমি সেখানে চলে যাও ; সেখানে এ পত্র দিলেই তারা তোমায় রাজা বলে মেনে নেবে, তোমাকেই নেতার সম্মান ও সমাদর দেবে।' শত্রু তো খুশী হয়ে সে পত্র বহন করে নিয়ে গেল—দিল তাদের হাতে। সে রাজ্যের প্রজারা দেখল, পত্রে লেখা আছে—"পত্রবাহকের মুণ্ডচ্ছেদ কর।" তখন সাধারণ প্রজাদের হাতেই অত্যাচারী শত্রুর বিনাশ হ'ল।

সে দিন ঘনিয়ে আসছে—জনশক্তির জাগার দিন। এতদিন সে ক্লোরোফর্মের নেশায় অজ্ঞান ছিল, মোহাচ্ছন্ন ছিল। সংস্কারের ঘাস খেয়ে খেয়ে, ভেড়ার দলে থাকতে থাকতে সিংহশাবকেরা ভেড়া বনে' গিয়েছিল ; কিন্তু সিংহত্ব তাদের নষ্ট হয় নি। একবিন্দু রক্তের

স্বাদে সিংহশিশু আবার জেগে উঠবে। সিংহত্ব জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পড়তে পারবে ভেড়ার দলে। ঘাড় মটকে তাদেরই রক্ত পান করবে—যারা তাদের এতদিন ভেড়া করে রেখেছিল। তোমরা যাকে এতদিন মা বলতে শিখিয়েছ, সে যখন রক্ত খেতে পারে, সন্তান তখন কাঁচা খেতেও দ্বিধা বোধ করবে না। অনিষ্টকারীদের এইভাবেই বিনাশ হবে। তাদের নিজেদের আনা অস্ত্রেই নিজেরা মারা পড়বে। সংস্কারের বেড়াজাল এইভাবেই ভেঙ্গে যাবে। সাম্যবাদের অন্তরায়গুলো দূর হয়ে যাবে, সমাজে বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। বেদের মন্ত্রে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সেই জাগার বাণী, ভাঙ্গার বাণী, নতুন করে গড়ার বাণীই দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জাগার বাণী, ভাঙ্গার বাণী, গড়ার বাণী বেদের মন্ত্রেই নিহিত আছে।

ভারতবাসী তাদের নিজেদের মাতৃস্বরূপা সেই বেদকে ভুলে গিয়েছিল। সন্তানকে শিশুবয়সেই যদি তার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে মা বলে চেনান হয়, তবে সে তার গর্ভধারিণী মাকে ভুলে যাবেই। তারপর বহুবছর পর যখন সে তার প্রকৃত মায়ের খোঁজ পায়, পরিচয় পায়, মনে মনে তাঁকে গ্রহণ করে নিলেও বাইরে থেকে প্রথম প্রথম তাঁর সঙ্গে মিশতে, 'মা' বলে ডাকতে অসুবিধা হয় ঠিকই। আবার পালনকর্ত্রীকে ছাড়তেও অনেকের অনেক সময় কষ্ট হয়, দুঃখ হয়; কিন্তু মাতৃস্নেহের বন্যায় সব দুঃখ ভেসে যায়, ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায়। আমরাও এতদিন সংস্কারকেই 'মা' বলে জেনে ছিলাম; বেদের বাণীর সঙ্গে, বেদের সুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। কিন্তু একবার যদি তার সত্য পরিচয় পেয়ে যাই, তবে তাকে চিনে নিতে, মেনে নিতে দেরী হবে না। আমাদের মধ্যে যে সুরের বীজ রয়ে গেছে, তার সঙ্গে ঠিকই মিলে যাবে।

বিষবৃক্ষের বিষ বাইরের সব কিছুকে নষ্ট করে দিলেও জীবের

প্রতিটি জীবের মধ্যে যে সত্য-বীজ রয়েছে তা কখনও নষ্ট হয় না—সংস্কারের ভারে চাপা পড়ে আছে মাত্র। বেদের সাম্যনীতির বারিধারায় তা আবার বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে।

মধ্যে যে সত্যের বীজ রয়েছে, তাকে নষ্ট করতে পারবে না। যুগ যুগ ধরে মাটিচাপা থাকলেও বীজ কখনও নষ্ট হয় না। বেদের সাম্যনীতির বারিধারা যখন গিয়ে পড়বে সে বীজের মধ্যে, তখন আবার সে জেগে উঠবে,—অঙ্কুরিত হবে, পল্লবিত হবে, পুষ্পিত হবে। ধীরে ধীরে বিরাট মহীরুহে পরিণত হবে। চারিদিকে বিস্তৃত হবে তার শাখা প্রশাখা। আর তারই স্নিগ্ধ ছায়াতলে সবাই প্রাণ পাবে—ফল পাবে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে বেদভিত্তিক সাম্যবাদের কথা বলতে চাচ্ছেন, তা বুঝলাম। আমাদের বিশ্বাস, আজকে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে এইরকম একটি উদার মতবাদেরই প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। কিন্তু শুধু মুখে মুখে বা কাগজে কলমে তো তাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না! দেশে এই ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং এ নীতির উপর সমাজকে গড়ে তুলতে হলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেই হবে। আপনার 'সন্তান দল' তো রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে না। সেইজন্য আমরা বেদের মত ও পথ অনুযায়ী C. P. I. (V) অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া (বেদিষ্ট) নাম দিয়ে একটা দল বা পার্টি গঠন করতে চাচ্ছি—যারা রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে এবং রাজনীতির মাধ্যমে দেশে আপনার বেদভিত্তিক সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

ঃ—চোদ্দদল চোদ্দশত দল হলেও ক্ষতি নেই। আগেই তো বলেছি—খণ্ডমেঘ খণ্ড খণ্ড হতে হতেই মিলিয়ে যায়। সুতরাং নতুন দলই কর, আর যা আছে তার রদবদলই কর, একটা কথা সব সময় মনে রাখবে—নীতি যেন সব সময় ঠিক থাকে। উদ্দেশ্যটা যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে। আজ এক কথা বললাম, কাল আর এক কথা বললাম—আজকের দিনে যা হচ্ছে, তা করলে চলবে না।

বেদকে যদি তোমরা আশ্রয় করতে চাও, তাকে অবলম্বন করে যদি নিজেদের কর্মপদ্ধতি স্থির করতে চাও, তবে বেদ কি—তার দর্শন কি—সে কি বলতে চায়, সেটা আগে ভাল করে বুঝে নাও। আমাদের দেশে আজ এক একটি সম্প্রদায় বেদের এক একটি শব্দ বা সূত্রের এক একটি অংশকে ধরে এমন এক একটি চরম মত দিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে সাধারণ লোকেরা কোন্‌টা গ্রহণ করবে ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই বেদ থেকেই তাদের যুক্তি, চিন্তা এবং দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে। প্রত্যেকেই বলছে—"আমি বেদকে অবলম্বন করেই এই কথা বলছি, সুতরাং আমার মতই সত্য।" কিন্তু সবার কথাই আংশিক সত্য, কারণ কেউই বেদের নির্যাসটুকু ধরতে পারেনি। বেদের মূল বক্তব্য ধরতে না পেরে, হয় তারা পুরোপুরি আস্তিক্যবাদী হয়ে উঠছে, না হয় পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে উঠছে। কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আস্তিক্যবাদ বা নাস্তিক্যবাদ—কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়।

'আছে' বা 'নাই' যে যাই বলুক, সে তার কল্পনা থেকে একটা ধারণা করেই তো বলছে। বেদ থেকে তারা তাদের মতের সমর্থনে কিছু কিছু শব্দ তুলে ধরছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাতে পারছে না। বেদ হচ্ছে জ্ঞান—এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তার কোনটাই কল্পনা বা ধারণাপ্রসূত নয়। সমস্ত কিছু যুক্তিনির্ভর এবং বিজ্ঞানসম্মত। বেদ হচ্ছে দর্পণ স্বরূপ। প্রকৃতির সমস্ত কিছুর প্রতিবিম্ব এতে ধরা পড়েছে। সুতরাং প্রকৃতির যে নীতি, বেদেরও সেই নীতি। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীবের যে ধর্ম, বেদেরও সেই ধর্ম। 'বেদ' সম্বন্ধে অনেকের এলার্জী আছে। বেদ বললেই তাদের মনে হয়, এটা একটা কাল্পনিক তত্ত্বকথার সঙ্কলন—একটা রহস্যময় আধ্যাত্মিকবাদ-এর ধারণা তাদের মনে জাগে। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বেদের বাণী, বেদের তত্ত্ব, বেদের দর্শন সম্পূর্ণভাবে

প্রকৃতির নীতিই বেদের নীতি—প্রকৃতির ধর্মই বেদের ধর্ম।

বাস্তবভিত্তিক। বেদ কোথাও কল্পনার কথা, অজানার কথা বলেনি। ভগবান 'আছে' বা 'নাই'—এর কোন কথাই বেদ বলেনি। 'ভগবান' শব্দটিই আদি বেদে নেই; 'দেবতা' কথাটি আছে। দেবতা সম্বন্ধে বেদ বলছে—প্রকৃতির যে যে বস্তুর কাছ থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি সেইগুলিই হচ্ছে দেবতা; সেই সেই বস্তুগুলির যত্ন নেওয়া হোক, সেগুলিকে রক্ষা করা হোক, সেগুলিকে কাজে লাগান হোক। বেদ বলছে—প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাও। আগেই কোন চরম সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবে না। দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হও। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাই দিয়ে শুরু কর। যা চোখে দেখছ, কানে শুনছ, সব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রছ, সেগুলিকে সত্য ধরে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে দেখ শেষ পর্যন্ত কোথায় উপনীত হও। তারপর তোমার সিদ্ধান্ত দাও। তার আগে পর্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার তোমার নেই। যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ছাড়া তুমি বলতে পারবে না "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।" আবার যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ছাড়া তুমি বলতে পারবে না "এই জগৎই সব—তার বাইরে আর কিছু নেই।" কোন কিছু সংকেত ধরে তোমার মনে যদি কখনও 'আছে' বা 'নাই' এর চিন্তা জেগে ওঠে, তখন সেই চিন্তার সূত্র ধরে তুমি তোমার বিশ্লেষণের কাজ আরম্ভ করতে পার। আপন মনে তুমি তোমার কাজ করে যাও। কিন্তু সেই ধারণা দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা তুমি কখনও করবে না। তুমি তোমার বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে যাও। রিসার্চ করতে করতে দেখ, তুমি কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাচ্ছ। সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার নিজের যখন কোন সংশয় থাকবে না, তখন তোমার কাজের গতি ও পরিণতির বৃত্তান্ত, তোমার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, তোমার প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত তুমি সমাজের কাছে পৌঁছে দাও। দেখবে, সমাজ তা সাগ্রহে, দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে। তার আগে পর্যন্ত 'আছে' বলারও

যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ছাড়া 'ভগবান আছে' বা 'নেই'—কোনটিই বলার অধিকার কারও নেই।

দরকার নেই, 'নাই' বলারও দরকার নেই। বেদের এই নীতি ও দর্শনকে যদি খুব ভালভাবে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী নিজেদের কর্ম-পদ্ধতি ঠিক করে নিতে পার, তবে দেখবে, সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

আজকের ভারতবর্ষ এই দুই চরমপন্থীদের মাঝে পড়ে বেদের প্রকৃত নীতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আর বেদ থেকে 'আস্তিক্যবাদ' ও 'নাস্তিক্যবাদ' নামে যে দুটো ধারা বেরিয়ে এসেছে, সেই উভয় দলেরই বেশ কিছু সংখ্যক 'এই জগৎই সত্য' এবং 'এর পরেও কিছু আছে কিনা দেখ'—বেদের এই কথা দুটির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে এবং অনেক সমাজবিরোধী কাজ করে চলেছে। তোমরা যদি কোন সংগঠন গড়ে তোল, তবে এ-দুটোকেই সমূহ বন্ধ করে কাজ করবে।

আস্তিক্যবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ এ দুটোকেই বর্জন করবে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি। আস্তিক্যবাদীরা বলছেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বিশ্লেষণ করলে, এর নিয়ম-শৃঙ্খলা-সমতা লক্ষ্য করলে মনে হয়, এর পেছনে একটি শক্তি যেন একে পরিচালিত করছে। সুতরাং তাঁদের চিন্তাধারা বস্তুজগৎকে ছাড়িয়ে গেল। সেখান থেকেই তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণের কাজ শুরু করলেন—কিভাবে সৃষ্টি হলো? কে আছে তার পেছনে? কি তার শক্তি?—এইভাবে রিসার্চ করে চলেছেন। চরম সিদ্ধান্ত কোথাও দেননি। স্বার্থান্বেষী এক দল তাঁদের এই বিশ্লেষণের ধারাটিকে বিকৃত করে ভগবান, পরলোক, যাক, যজ্ঞ—নিজেদের মনগড়া কতকগুলো তত্ত্ব ও তথ্যকে বেদের নাম দিয়ে নিরীহ সহজ-সরল-প্রাণ লোকদের মনে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে চলছে। আজ এই সব ধারণা তাদের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সেগুলি থেকে তাদের মুক্ত করে সত্যকার বেদের তত্ত্ব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এমনভাবে তাদের প্রভাবিত করা হয়েছে যে, তাদের বুঝের গণ্ডির

বাইরে যেতে তারা আর পারছে না। ডানা তাদের ভারি হয়ে গেছে। তাদের সংস্কারের পিঞ্জর থেকে মুক্ত করে আবার মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে শেখাতে হবে। তার জন্য অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। তোমাদের সংগঠন যেন এ কাজের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এ কাজ কিন্তু বড় কঠিন কাজ। এতদিনকার সংস্কারে যখন নাড়া পড়বে, তখন তারাও বিদ্রোহ করতে পারে। কারণ বেদকে তারা বিশ্বাস করে এবং শ্রদ্ধা করে। তাদের বোঝান হয়েছে, বেদই বলছে—ধর্ম হচ্ছে পূজা, অর্চনা, যাগ, যজ্ঞ। পরলোক, জন্মান্তর—এগুলি হচ্ছে বেদেরই তত্ত্ব। যাতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ইহলোকে দুঃখ ভোগ করতে না হয়, মৃত্যুর পর যাতে অনন্ত স্বর্গবাস হয়, তার জন্য পূজা কর, হোম কর। এছাড়া ধর্ম আর কিছু নয়।—সরলপ্রাণ, নিরীহ ভারতবাসী এগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে, সেইভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। আর স্বার্থান্বেষীদের ভুঁড়িও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তোমাদের কর্তব্য হবে—এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে, সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত করে তাদের সত্যের সন্ধান দেওয়া। সব সময় মনে রাখবে—'ছাড় ছাড়' বললেই তারা কিছু ছেড়ে দেবে না, আবার 'ধর ধর' বললেই তারা নতুন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে না। তোমাকে হতে হবে বিশ্লেষণমুখী। ওরা যতটুকু জানে, যতটুকু বোঝে, ততটুকুর মধ্যে থেকে বিশ্লেষণ করে করে বুঝিয়ে দাও। তুমি যতটুকু জান, তার মধ্যেই তোমার চিন্তাধারা, যুক্তি ঠিক রাখ। জানা জগতের বাইরে যাওয়ার এখন কোন প্রয়োজন নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—এটাই হচ্ছে তোমার সমূহ জানা জগৎ। এইটুকুই এখন তোমার সীমা। এখন পর্যন্ত ঐটুকুই মেনে নিয়ে তোমার কর্ম-পদ্ধতির ধারা, আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবে। তোমরা প্রমাণে না আসা পর্যন্ত জন্মান্তর, পরলোক, ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ করতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত না ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হও এবং অপরকেও নিঃসন্দেহ করতে পার, ততদিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন

ধর্ম অর্থ—ন্যায় ও কর্তব্য।

কিছু আলোচনা করারই প্রয়োজন নেই। ধর্ম বলতে এইটুকুই বুঝবে—ন্যায় ও কর্তব্য।

আজ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই ভগবানে বিশ্বাসী। কিন্তু একটা ঘরে অনেক টাকাকড়ি রেখে দুয়ারের সামনে একটি অজগর সাপ রেখে দাও, কেউ আর সেই ঘরের ত্রিসীমানায় আসবে না। অথচ যদি সেই ঘরে ডবল তালা ঝুলিয়ে বল—ভগবান সর্বত্র আছেন, এঘরেও তিনি বিরাজিত, এখানে তিনিই পাহারা দিচ্ছেন—ক'জন শুনবে সে কথা? পরদিনই দেখবে দরজার তালা ভাঙ্গা, ঘরে কিছুই নেই। অথচ তারা বলছে, 'ভগবানে বিশ্বাসী।' ভগবানের চেয়ে পুলিশের দোহাইকে ভয় পাচ্ছে বেশী। কেন এই দোমনা-ভাব? কারণ তার অস্তিত্বকে প্রমাণে আনতে পারে নি। তাই সেখানে তারা সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করতে পারছে না, নির্ভর করতে পারছে না। যখনই নিশ্চিন্তভাবে এক জায়গায় মন স্থির করা যাচ্ছে না, তখনই আসছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তার থেকেই সমস্যা, তার থেকেই জটিলতা। ভগবানকে যদি প্রমাণে এনে সকলেই সেখানে একই ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত, নির্ভর করতে পারত, তবে দেখতে—সমাজের রূপ, দেশের রূপ অন্যরকম হতো, এক অপূর্ব ধারায় চলে যেত। তা তো হচ্ছেই না, বরং আস্তিকাবাদের সুযোগ নিয়ে একটা বৃহৎ গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও দেশ-জাতির সর্বনাশ করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে। এদের ওপরই আমার আক্রোশ। আস্তিক্যবাদের ওপর আমি কোন আক্রমণ করছি না। এই শোষক সম্প্রদায় জায়গায় জায়গায় আশ্রম, মঠ, মন্দির করে, 'বাবাজী', 'ব্রহ্মচারী', 'আনন্দ' নামধারী হয়ে সমাজকে নিঃশেষে দোহন করে চলেছে। অনেক সহজ সরল ধর্মপ্রাণ নরনারী আছে, যারা ঐ শোষকগোষ্ঠীর প্রভাবে ভগবান, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আমার কথায় হয়তো তারা আঘাত পাবে। তার জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তাদের

আস্তিক্যবাদের সুযোগ নিয়ে যারা দেশ ও জাতির সর্বনাশ করছে, তাদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।

আঘাত দেওয়া নয়, তাদের সাবধান করে দেওয়া। সমাজে যখন ভাঙ্গন ধরেছে, তখন তাদের এ আঘাত সহ্য করতেই হবে। টাইটানিক জাহাজে ভাল মন্দ সকল মানুষই উঠেছে ; —জাহাজ ফুটো হয়ে গেল। তখন তো শুধু ভাললোকদের বাদ দিয়ে মন্দলোকদের নিয়েই জাহাজ তলিয়ে যাবে না ! সকলকে নিয়েই তলাচ্ছে। তখন সকলকেই সাবধান করে দিতে হবে। সমাজের আজ সকল দিকে ছিদ্র হয়েছে। খাদ্য, অর্থ, শিক্ষা, ধর্ম, বাস্তব-জীবন, আধ্যাত্মিক-জীবন—সকল দিকে জটিলতা, সকল দিকে সমস্যা। কোন দিকই সফল হতে পারছে না। এমন একটা দিক নেই, যা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারা যায়—হ্যাঁ, আমাদের এদিকটা উন্নত ; একদিকে খালি হয়ে গেলেও আর এক দিক নিয়ে আমাদের দেশবাসী নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কিন্তু তা তো নয়। তাদের কিছুই হয় নি। যেখানে ছিল, আজও সেখানেই আছে। শত-সহস্র বছর ধরে এই সরল-প্রাণ নিরীহ ব্যক্তিদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। বেদজ্ঞরা বলছেন—এটা সমীচীন নয়। ভগবান যদি থেকে থাকে, খুব ভাল কথা। আমরা 'নাই' একথাও বলছি না। কিন্তু না জানা পর্যন্ত 'আছে'-ও বলব না। এটাই বেদের কথা। তাই বলছি—জন্ম ও মৃত্যুর মত যখন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসে আসতে পারবে, তখনই সে সম্পর্কে চিন্তা ও কাজ শুরু করবে এবং অপরকে বলতে পারবে। তার আগে নয়। যেমন ধর, তোমার স্থির বিশ্বাস—খনন করলেই জল মিলবে। তখন তুমি যত কষ্ট হোক, যত পরিশ্রম হোক, যত ফুট তলেই হোক, খনন করতে আরম্ভ করবে। খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় ঠিকই জলের সন্ধান পাবে। কিন্তু খালি জায়গায়, না জেনে অন্ধকার হাৎড়ে তো কোন লাভ নেই ! যদি বুঝতাম, ভগবান-বিশ্বাসী হলে বা অদৃষ্টবাদী হলেই বাস্তবের সমস্যা আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না—চিরশান্তিতে সে থাকবে—তা হলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু তাও তো নয়। অশান্তির আগুনে তাদের বেশীর ভাগই জ্বলছে। নিজেরা পুড়ছে, সমাজকে

পোড়াচ্ছে। ভগবান-বিশ্বাসী, অদৃষ্টবাদী হয়ে সমাজে শুধু মার খেয়েই চলেছে—ভাত আর খেতে পায় না। চোখের সামনে খাদ্য, অথচ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তারা হয় না খেয়ে মরছে, না হয় রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে খেয়ে অসুখে মরছে! এই তো পরিণতি! ভগবান-বিশ্বাসী হয়ে আজ অধিকাংশই মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। কোন বিপ্লবের বুদ্ধি নেই। রুখে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তাদের বোঝান হয়েছে—পূজা-অর্চনা জপ-সাধনা কর, একদিন সব মিলবে। কিন্তু এত করেও যখন কিছু মিলছে না, তখন রেডিমেড উত্তর তো ঠিকই আছে—'জন্ম জন্মান্তরের পাপের ফল' কিংবা 'কাম বর্জন করতে পারনি'। বলার আর কিছু নেই। আমাদের দেশের লোকেরা সেই কথাই মেনে নিয়ে আবার জন্মজন্মান্তরের পাপ খণ্ডন করার জন্য নতুন করে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করল—দান, ধ্যান, শান্তি স্বস্ত্যয়ন শুরু করল। এইভাবে সমাজ ক্রমশঃই ভাঙ্গনের দিকে গড়িয়ে চলেছে!

বেদজ্ঞরা বলেছেন—সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যেমন অপরাধ, তার প্রতিবাদ না করাও তেমনি অপরাধ। আজকের মানুষ সেই অপরাধে অপরাধী। তোমাদের বর্তমান কাজ হচ্ছে—যে সব সম্প্রদায় আজ ধর্মের নামে, ভগবান বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ব্যবসা আর জমিদারী ফেঁদে বসেছে, তাদের উচ্ছেদ করা। যাও সকল তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। তাদের বল—হয় উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে তোমাদের মতে আমাদের টেনে নাও, না হয় তল্পি গোটাও। এতদিন slow poison ক'রে সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়েছ, এখন আর তা চলবে না। তোমাদের একচ্ছত্র জমিদারীগিরি সমূলে শেষ ক'রে জমিতে গিয়ে নাম। লাঙ্গল ধর, চাষ কর। যতদিন পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ না পাচ্ছ, ততদিন পর্যন্ত বাস্তবের পথই তোমাদের পথ। তোমরা তোমাদের সংগঠন নিয়ে গ্রামে চলে যাও, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে চলে যাও। সেখানে নিজেরা পরিশ্রম কর, খেটে খাও। বেদ বলছে—শ্রমই হচ্ছে সমাজের উন্নতির সোপান। শ্রমজীবীরাই

সমাজের স্তম্ভ। তাই শ্রমিক হয়ে সবাই কাজ কর। ভগবানের দোহাই দিয়ে, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে কেউ যেন বসে না থাকে। কেউ যেন কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে না খায়। সাথে সাথে একটি কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি —'ভগবান আছে' এ কথা যেমন বেদ বলছে না, 'ভগবান নেই'—এ কথাও বেদ বলছে না। তাই যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের একজনও যদি তাদের সপক্ষে এমন প্রমাণ দেখাতে পারে যা সবজনগ্রাহ্য, যে প্রমাণে কোন বিবাদ-বিতর্ক নেই, জন্ম-মৃত্যুর মত যার সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাক'ব না, প্রতিটি ব্যক্তি যা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারবে—তখন কিন্তু তোমরা তাদের মত গ্রহণ করতে মুহূর্তও দ্বিধা করবে না সেদিন তোমাদের পথের ধারা পরিবর্তন করে নতুন দিকে চালিত করবে।

শ্রমই সমাজের উন্নতির সোপান, শ্রমজীবীরাই সমাজের স্তম্ভ। তাই তথাকথিত সকল সাধু-সন্ন্যাসীকে ধর্মের ব্যবসা ছেড়ে জমিতে নামতে বাধ্য করতে হবে

এতক্ষণ তোমাদের বেদের আস্তিক্যবাদীদের বিশ্লেষণের ধারা এবং তার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীব ব্যবসার কথা বললাম। এখন বেদেরই আব একটি ধারার কথা বলছি। বেদের বস্তুতত্ত্বের দিকটি ধরে এক সম্প্রদায় চিন্তা করতে লাগলেন—এর বাইরে যখন আমরা প্রমাণে আনতে পারছি না, তখন ওদিকটা নিয়ে চিন্তা করারই দরকার নেই। তাঁদের চিন্তা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। এই বস্তুজগতেরই উন্নতি সাধন করার জন্য তাঁরা নানাভাবে রিসার্চ করে চললেন। এঁদের বলা হচ্ছে 'বস্তুবাদী'। আস্তিক্যবাদের সুযোগ নিয়ে যেমন একদল নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করে নিচ্ছে, বস্তুবাদের সুযোগ নিয়েও আবার ঠিক সেই রকম এক শ্রেণীর লোকেরা আর একদিক থেকে ব্যবসা শুরু করল। তারা প্রচার করতে লাগল—'ভগবান নেই, ধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। এই জগৎটাই সব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যেন-তেন ভাবে জীবনটাকে উপভোগ করে

আস্তিক্যবাদীদের ন্যায় নাস্তিক্যবাদী তথা বস্তুবাদীরাও সংস্কারমুক্ত নয়—তারাও সমাজের সমান ক্ষতিকারক।

নাও।' এই জীবনটাই যখন সব, পাপ-পুণ্য বলে যখন কিছু নেই, তখন তারা নির্ভাবনায় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করছে আর সব অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে লাগাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গিয়ে হামলা করছে, গোলমাল বাধাচ্ছে। ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে অশান্তি অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কর্মপদ্ধতিতেও সমাজে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা আসছে না। তার কারণই হচ্ছে, তারা তাদের মতের সপক্ষে এমন কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেখাতে পারছে না, যা সর্বজন-গ্রাহ্য। তারা যে 'নেই' বলছে—এটাও একটা ধারণা থেকেই বলছে। কোন রকম বিশ্লেষণের মধ্যে, যুক্তির মধ্যে বা প্রমাণের মধ্যে না গিয়েই তারা তাদের চরম সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে—'এই জগৎটাই সব।' সুতরাং এরাও সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। এরাও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। মনে রেখো, আমি কিন্তু বস্তুবাদ বা বস্তুবাদীদের আক্রমণ করছি না। তাঁরা তাঁদের ধারণাকে ধরে বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে গেছেন এবং বস্তুজগতের উন্নতিতে মগ্ন থেকেছেন। যার ফলে বিজ্ঞানের আজ এত উন্নতি। তা সত্ত্বেও তাঁরা কোন চরম সিদ্ধান্তে এখনও এসে পৌঁছান নি। এখনও তাঁরা বিশ্লেষণের পথেই রয়ে গেছেন। নতুন নতুন ধারায় তাদের চিন্তা ও কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই বস্তুবাদের আড়ালে থেকে যে সম্প্রদায় মানুষের মনুষ্যত্বকে, সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজ-বিরোধী কাজে উস্কানি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমার কথা। তারাও চরমপন্থী, তারাও গোঁড়ামি ও সংস্কারকে ছাড়তে পারে নি। একদল মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে, গ্রহ-নক্ষত্রের ভয় দেখিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞের নামে সমাজকে শোষণ করছে ; আর একদল ঠিক বিপরীত কাজ করছে। তারা বলছে—সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক—এসব ছেলে ভুলান কথা। তাদের এইসব কথায় উস্কানি পেয়ে এক শ্রেণীর লোকেরা সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে সমাজের বা দেশের কোন সুরাহাই হচ্ছে না। সুতরাং এদের কোনটাই তোমরা বর্তমানে গ্রহণ করবে না। এই উভয় চরমপন্থীর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবে।

আর একটা কথা মনে রাখবে। ঐযে বেদের দুইটি ধারার কথা বলেছি—একটি ভাববাদ, আর একটি বস্তুবাদ—তাদের কোন মতকে তোমরা এখন ভুল বলে উড়িয়ে দিতেও পারবে না। কারণ তারা এখনও তাদের চরম সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় নি। এই দুই ধারা থেকে যে দুই চরমপন্থী গজিয়ে উঠেছে, তাদের কোন মতকেও প্রমাণে না আনা পর্যন্ত নির্ভুল বলে গ্রহণ করবে না। তোমার বুদ্ধির সীমানা যতটুকু, তার মধ্যেই থেকে তুমি তোমার কাজ করে যাও। যা জাননা, যা বুদ্ধির অগম্য—তা নিয়ে হৈচৈ করার প্রয়োজন কি? তুমি শুধু দেখবে—কেউ যেন না জেনে, না বুঝে দুটোর একটাও উচ্চারণ না করে। এখন পর্যন্ত যখন কোনটাই প্রমাণে আসছে না, তখন দুটো কথাই সমাজের উন্নতির পথে বাধা চিন্তা করে, দুটোকেই বর্জন করতে হবে। 'আছে' বা 'নেই'—কোনটা নিয়েই মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন যার উপর দাঁড়িয়ে আছ, তার কথা চিন্তা কর। পাপ-পুণ্যের কথা না ভেবে ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা কর। তোমার কর্মপদ্ধতির ধারা এমনভাবে গ্রহণ কর, যাতে তোমার ও তোমার সমাজের খারাপ না হয়ে ভাল হয়। তোমার কাজে তোমার পাপ হবে, না পুণ্য হবে—তুমি স্বর্গে যাবে, কি নরকে যাবে—একথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, তোমার মঙ্গল হবে, কি অমঙ্গল হবে—সমাজের কল্যাণ হবে, কি অকল্যাণ হবে—দেশ স্বর্গে পরিণত হবে, না নরকে পরিণত হবে—সেই কথাই চিন্তা কর। তবে দেখবে, আর কোন সমস্যাই থাকবে না।

তোমরা হবে বিশ্লেষণমুখী, জ্ঞান-পিপাসু এবং পক্ষপাতশূন্য; সকল প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধে তোমাদের জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।

যে দুই গোঁড়াপন্থীর কথা বলছি, তারা সব সময় তোমাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। তোমরা কিন্তু তোমাদের ঠিক রেখো। তোমরা হবে বিশ্লেষণ-মুখী, জ্ঞানপিপাসু। একটা দিকে biased হয়ে কাজ করবে না। তোমাদের মূল পথ হবে জানার পথ। সেই পথে চলতে চলতে যদি দেখ—ভগবান আছে, তবে সেই মতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে। যদি দেখ—নেই,

তখন সে মতকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করবে না। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কোন মতকে গ্রহণ করারও দরকার নেই, সে মত শুনে নাসাকুঞ্চন, ভ্রূকুঞ্চন করারও দরকার নেই। তোমার কর্তব্য হলো—নিজেরা সংস্কার-মুক্ত হয়ে, সমাজকে সেই সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত করে আনা। ভালবাসার মাধ্যমেই হোক আর বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক, সংস্কারকে নাশ করতেই হবে। ভাল কথায়, ভালভাবে যে একেবারে কিছুই হবে না, তা নয়। কিন্তু বিপ্লবের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। জীবন উৎসর্গ করে লড়াই করতে হবে। তোমাদের হাতে থাকবে শাস্ত্রের অস্ত্র—ত্রিশূল, বর্শা, ঢাল, তরোয়াল। এই অস্ত্র ধারণ করে তোমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাও। তিলে তিলে যারা সমাজকে নিঃশেষ করছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান শুরু কর। আর যারা একটা সংস্কারকে ছাড়ার কথা বলতে গিয়ে আর একটা সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছে, তাদের বিরুদ্ধেও তোমাদের জেহাদ ঘোষণা কর।

প্রশ্ন ঃ—আপনি যে বিপ্লবের কথা বলছেন, সেটা শেষ পর্যন্ত শুধু মারামারি আর হানাহানিতে শেষ হবে না তো?

উত্তর ঃ—বিপ্লবের পথ সংগ্রামের হলেও মারামারি হানাহানিই এর উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্য প্রেম ও শান্তি। বিপ্লবের পথে যখন তুমি নামছ, তখন কাউকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি নামছ না। সমাজের বহুসঞ্চিত ক্লেদগুলো বের করে দেওয়াই তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিপ্লবীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, সমাজকে খুন ক'রে অনাবশ্যক রক্ত-পাত করার জন্য নয়। খুন আর অপারেশন—দুটোতেই অস্ত্র ধরতে হয়, দুটোতেই রক্তক্ষয় হয়। দুটোতেই কাতর-ধ্বনি ওঠে। কিন্তু ঐ দুটো কাজ কি এক? বিপ্লব সমাজকে ভাঙ্গার জন্য নয়, গড়ার জন্য। বিপ্লব সমাজকে নিঃস্ব করার জন্য নয়, ঐশ্বর্য-শালী করার জন্য।

মারামারি হানাহানিই বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়—বিপ্লবের উদ্দেশ্য—প্রেম ও শান্তি। বিপ্লব সমাজকে ভাঙ্গার জন্য নয়, গড়ার জন্য।

তোমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় যদি উন্মাদ হয়ে যায়, কিংবা নেশাগ্রস্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তার উন্মত্ততায় ও উৎপাতে তোমার সংসারের শান্তি যদি ভঙ্গ হয়, যদি সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে বসে, তবে তুমি কি করবে? সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য হয় তখন তুমি তাকে হাতে-পায়ে কড়া দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখবে, না হয় তাকে জোর করে ধরে-বেঁধে পাগলা-গারদে দিয়ে আসবে। বাইরে থেকে যারা দেখবে, তারা মনে করতে পারে—তুমি খুব নিষ্ঠুর, অত্যাচারী। তোমার পথটা এখানে নির্মম হতে পারে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য এখানে মহৎ—সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং যে অসুস্থ তাকে সুস্থ করে তোলা। বিপ্লবও সেইরকম। বাইরে থেকে এর পথটাকে দানবিক মনে হলেও উদ্দেশ্যটা মানবিক।

কতকগুলো উন্মাদের হাতে পড়ে আজকের সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এদের উৎপাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে এবং এই উন্মাদের অজ্ঞানতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে বিপ্লবেরই প্রয়োজন।—আমি বিপ্লবে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন ঃ—অর্থাৎ আপনি বলতে চান—এখন শুধু মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানির মধ্য দিয়ে ধ্বংসই চলুক। এর কোন প্রতিকার করার দরকার নেই।

উত্তর ঃ—চৈত্র মাসে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে। দেখেছ সে ঝড়? কি প্রচণ্ড তার রূপ! সূর্য মেঘের আড়ালে,—চারিদিক তমসাচ্ছন্ন, ঝড় তুফান। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে তছনছ হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারপরই আসে নববর্ষের প্রভাত। এখন কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। সত্য-সূর্য আজ মেঘাচ্ছন্ন। ঝঞ্ঝা-ঝড়ের প্রলয় নৃত্যে সব কিছু তছনছ হয়ে যাবে। সেই ঝড়ের বেগেই আবার মেঘ উড়ে গিয়ে সত্য-সূর্য প্রকাশিত হবে। সূর্যের আলোকে তমসা দূর হবে। তখন সেই সূর্যের আলোকে দেখতে পাবে—গণদেবতা সজাগই আছে। মাঝে মাঝে মেঘখণ্ড এসে সাময়িকভাবে সূর্যকে আবৃত ক'রছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে

গণদেবতার স্তব্ধতা নিষ্ক্রিয়তা প্রলয়েরই পূর্বাভাস।

যাচ্ছে। মনে হ'চ্ছে যেন গণদেবতা নিদ্রিত। কিন্তু তা নয়। ঝড় ওঠার আগে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। গাছের পাতা নড়ে না, নদীর জল দোলে না। মনে হয় তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। —তারপরই গাছপালা দুলে ওঠে, সাগরের জল ফুলে ওঠে। সবকিছু ফুঁসে ওঠে, গর্জে ওঠে। শুরু হয় ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। সেই রকম, ঝড়ের আগে গণদেবতা আজ স্তব্ধ। মনে হ'চ্ছে সে যেন মৃত। কিন্তু তা নয়। এটা তার রুখে দাঁড়াবারই ইঙ্গিত। এরপরই সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আর ফাঁকি চ'লবে না। যত অত্যাচার আসুক না কেন, গণদেবতার ক্ষমতাই সেগুলো দমন ক'রবে। জীব-জগতের প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই দমন করার শক্তি নিহিত। গণদেবতা সেই মিলিত শক্তিরই রূপ। সে মিলিত শক্তির প্রতিক্রিয়ায় একদিন ঝড় উঠবেই। সেই ঝড়ে চারিদিক ওলট-পালট হয়ে যাবে। তারপরই নববর্ষের সূচনা।

বন্যায় চারিদিক প্লাবিত হয়ে যায়—মনে হয় কত না ক্ষতি হলো। কিন্তু তারই বহন ক'রে আনা পলিমাটিতে নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত। চোদ্দ-দল ভেঙ্গে ভেঙ্গে হোক না চোদ্দশত দল। উঠুক ঝড়। ঝড়ের বেগে বাতাসের ঝাপ্‌টায় খণ্ডমেঘ খণ্ড খণ্ড হ'তে হ'তেই নিঃশেষিত হয়। তারপর যখন আদি, অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় সূর্য প্রকাশিত হবে, তখন দল দল মেঘে আকাশ আর কালো হয়ে থাকবে না। এক সূর্যে সব কিছু আলো হয়ে যাবে। সুতরাং চিন্তার কি আছে ?

প্রতিকার আপনিই হবে। অঙ্কের খাতায় গণিতের ফল না মেলা পর্যন্ত কাটাকাটি চ'লতেই থাকে। কাটতে কাটতে অঙ্ক ক্রমশঃ সরল থেকে সরলতর হ'তে হ'তে সরলতম হয়ে যায়। তখন ফল আপনিই মিলে যায়। একদিকে কাটার যন্ত্রণা, অন্যদিকে ফল মিলে যাওয়ার আনন্দ। এই তো নিয়ম! আজ দেশ ভাঙ্গনের মুখে। প্রকৃতির

গণিতের ফল না মেলা পর্যন্ত কাটা-কাটি চলতেই থাকে।

নিয়ম অনুসারে নদীর এক পাড় ভাঙ্গে, আর এক পাড় গড়ে। কালের নদী ব'য়ে চলেছে—আর এক নতুন দেশ নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। সৃষ্টির নিয়মই এই। একদিকে গর্জন, আর একদিকে বর্ষণ। একদিকে ধ্বংস, আর একদিকে বংশ। একদিকে প্রলয়, আর একদিকে সৃষ্টি। ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণার মধ্যে আবির্ভূত হবে নবজাত শিশু; শোনা যাবে তার বেঁচে ওঠার ওঙ্কার-ধ্বনি।

প্রশ্ন ঃ—তার মানে আপনি মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি হিংসাত্মক কাজকে সমর্থন করেন। এতে যে আমাদের মত কত অসহায় নিরীহ লোকের মৃত্যু হ'চ্ছে, আরও কত লোকের হ'তে পারে—তার উপায় কি হবে?

উত্তর ঃ—কত নিরীহতর জীব যে কালের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তুমি নিজেও কতজনকে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মেরে ফেলছ—সে কথা চিন্তা করেছ কি? শুধু তোমাকে, আমাকে, আর মানবগোষ্ঠীকে নিয়েই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নয়! গাছ-পালা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, মানুষ—সকলকে নিয়েই এই জগৎ। এই বিশ্বজগতে তোমার, আমার আর মশা-মাছির মধ্যে কতটুকুই বা তফাৎ? আমার তো মনে হয়, কোন পার্থক্যই নেই। মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গকে ধ্বংস ক'রতে তো তুমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রছ না? তোমার চলার পথে, তোমার বাঁচার পথে এরা অসুবিধার সৃষ্টি ক'রছে—অতএব এরা অনিষ্টকারী, ক্ষতিকারক, রোগের জীবাণুবাহক। সুতরাং এদের যেভাবে হোক ধ্বংস কর। ক'রছও তাই। তখন তো তোমাদের মুহূর্তের জন্যেও মনে হ'চ্ছে না—এগুলি হিংসাত্মক কাজ! তখন তো তুমি মারামারি-কাটাকাটিকে বেশ সমর্থন ক'রছ! শুধু মানুষের বেলায় এগুলি হিংসাত্মক কাজ, আর এদের বেলায় নয়—তা ভাবলে চ'লবে কেন?

প্রশ্ন ঃ—কিন্তু মানুষ তো শ্রেষ্ঠ জীব। তার অধিকার আগে।

উত্তর ঃ—এই জীবজগতে কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি সকলেই একই মাটিতে, একই আকাশতলে, এক সূর্যের

আলোয়, একই জল-হাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং অধিকার একজনের কম, আর একজনের বেশী হবে কেন? এতে সকলেরই সমান অধিকার। আর শ্রেষ্ঠতার কথা ব'লছ? মানুষ শ্রেষ্ঠ, ওরা নিকৃষ্ট—এ কথা কি ক'রে বলব? দৈহিক আকার ও শক্তির দিক থেকে যদি বল, তবে মানুষের থেকে অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী প্রাণী এ জগতে আগেও ছিল, এখনও আছে। চোখের সামনে হাতীকে তো দেখছই। তাছাড়া সাগরের জলে কত বিরাট জন্তু আছে, মানুষ তাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। আফ্রিকার জঙ্গলেও কত জন্তু-জানোয়ার আছে। আবার মনের বিকাশ ও শক্তির দিক থেকে যদি বল, তবেও আমি কাউকেই কারুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ব'লতে পারি না। মশা, মাছি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-ভালবাসা, রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা—সবই মানুষের মত। মাত্রায় কম বেশী হ'তে পারে, কিন্তু গুণগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা এক। তাছাড়া প্রত্যেক জীবের মধ্যেই প্রতিটি শক্তি নিহিত। প্রত্যেকেই প্রতিটি বৃত্তি, প্রতিটি শক্তির অধিকারী। প্রয়োজন অনুসারেই কারুর কোনটা বেশী, কারুর কোনটা কম। মানুষের বুদ্ধি বেশী, বৃত্তি কম। আবার কীট-পতঙ্গের বৃত্তি বেশী, বুদ্ধি কম। তুমি বুদ্ধি দিয়ে যেটা পার, ওরা বৃত্তি দিয়েই সেটা পারছে; ওরা বৃত্তি দিয়ে যেটা পারে, তুমি বুদ্ধির প্রয়োগ ক'রে সেটা সম্পন্ন ক'রছ। যেমন ধর, মানুষ আজ বুদ্ধির চরম প্রয়োগ ক'রে চাঁদের দেশে উড়ে গিয়ে গৌরব অনুভব ক'রছে। অথচ মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গ, পাখী—এরা তাদের সহজাত বৃত্তির ক্ষমতাতেই জন্মের সাথে সাথে আকাশে উড়তে পারছে। আবার অনেক সময় মানুষ বুদ্ধির দ্বারা যা ক'রছে, অন্যান্য প্রাণী বৃত্তির দ্বারা সেটা পারছে না। সেইরকম পশু-পাখীরা বৃত্তির দ্বারা যা ক'রছে, মানুষ শত চেষ্টায়, বিজ্ঞানের শত কলা-কৌশল প্রয়োগেও তা ক'রতে পারছে না। একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। আমাদের এত বড়, এত শক্তিশালী যে পুলিশবাহিনী,

গাছ-পালা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ আর মানুষ—এদের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নেই। সবার অধিকার এক।

তার থেকে বাছাই করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিয়ে তৈরী হয়েছে "ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।" তারা পর্যন্ত হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছে একজন সাধারণ অপরাধীকে খুঁজে বের ক'রতে। শত চেষ্টার পর অসমর্থ হয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হ'লো 'লাকি' আর 'লেসি'র কাছে। শেষকালে কুকুরের লেজ ধ'রেই তাদের রহস্য ভেদ করতে হলো, তারা সত্যের সন্ধান পেল। পশুর বৃত্তির কাছে মানুষের বুদ্ধি তো হার মানল! এইরকম অনেক গুণ পশু-পাখীদের আছে, যা মানুষের নেই। ঘরের মধ্যে যদি কোথাও এককণা চিনি লুকিয়ে রাখ, মানুষের সাধ্য নেই তা খুঁজে বার করে। অথচ একটা পিপীলিকা, আরশোলা বা টিকটিকির এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। একটা আম কাট, পাশের ঘর থেকে কেউ টের পাবে না; অথচ শতশত মাইল দূর থেকে তার গন্ধ পেয়ে ছুটে আসবে মাছি। এত শক্তিশালী তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়! সব বৃত্তি-শক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তিই মানুষের চেয়ে পশুর বেশী। একটা সদ্যোজাত হাঁসকে জলে ছেড়ে দাও, দুই-একবার হাবুডুবু খেয়েই সে সুন্দর সাঁতার কাটতে আরম্ভ ক'রবে। আর মানুষকে সাঁতার কাটতে হলে কত কসরৎ করতে হয়! একটা সাপকে আঘাত দিয়ে যতদূরেই পালিয়ে যাও, সেই সাপ ঠিক ঠিক আঘাতকারীকে খুঁজে বা'র ক'রে তার আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। এরকম ঘটনা তোমাদের হয়তো অনেকেরই দেখা আছে, পত্রিকাতেও পড়েছ।

সুতরাং বুদ্ধি বড়, না বৃত্তি বড়; মানুষ শ্রেষ্ঠ, কি পশু শ্রেষ্ঠ—এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় হয় না। কেউ কারুর থেকে শ্রেষ্ঠও নয়, নিকৃষ্টও নয়; বড়ও নয়, ছোটও নয়। কেন তবে শুধু মানুষের বেঁচে থাকার কথাই চিন্তা ক'রবে, আর অন্যান্য জীবের কথা চিন্তা ক'রবে না? মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি কাটাকাটিটাই হিংসা হবে, আর অন্যান্য প্রাণীর বেলায় সেটা হিংসা হবে না—এ চিন্তা যুক্তিযুক্ত তো নয়ই, শুভও নয়। সকল জীবের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত এবং এটাও জেনে রাখা উচিত যে, শিষ্টের রক্ষায় অশিষ্টের বিনাশ করাটা হিংসা নয়। যা

শুভ, তার জন্য অশুভর ধ্বংসই কাম্য। তাতে হিংসাকে সমর্থন করা হয় না।

আর একটা কথা মনে রাখবে—একটার শেষই আর একটার শুরু। এইভাবেই তো চলেছে সৃষ্টিচক্র। যেদিকে তাকাও—একই নীতি। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝ'রে যাচ্ছে, বসন্তে আবার নতুন পাতা গজাচ্ছে। ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে, তার থেকেই ফল ফ'লে উঠছে। নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে, তারপরই আকাশ ভেঙ্গে বর্ষার ধারা নেমে আসছে। দেখছ, একটা ধ্বংসাত্মক কিছু না ঘটলে সৃজন-কাজ হ'চ্ছে না। তাছাড়া তুমি বলছ—আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলেছি; আমি দেখছি, সব কিছুই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। কারটা ঠিক বলবে? নবজাত শিশুর প্রথম হাঁচিটা যখন প'ড়ল, তখন থেকেই তো শুরু হ'লো তার মৃত্যুর দিকে পদক্ষেপ!

জীবনকে ভোগ করার জন্য মানুষ কি না করে! রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেঞ্জে যাচ্ছে, খোলা-মেলা জায়গায় বাড়ী ক'রছে, ব্যায়াম ক'রছে, খাচ্ছে, ফূর্ত্তি ক'রছে, আনন্দ করছে। তাদের কার্য-কলাপে মনে হয় চিরদিন তারা বুক ফুলিয়ে এই পৃথিবীতে বাস করবে। কিন্তু পথিক! ভুলে যেও না, আমরা সব শ্মশানের যাত্রী। যত তুমি সুখের সন্ধানে যাও, খাও-দাও, আনন্দ-ফূর্তি কর, কবরই আমাদের শেষ পরিণতি। কত রোগ-শোক, আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মৃত্যুরই দিকে। তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—তাদেরও পূর্বপুরুষেরা একদিন তোমাদের মতই জীবনকে উপভোগ করেছিল। বেঁচে থাকার জন্য তোমাদের মতই থলি হাতে বাজার করেছিল,। আজকের মত সেদিনও তারা চিন্তা করেছিল—'আমরাই সব।' আজ তারা কোথায়? তারা নেই, কিন্তু তাদের থেকেই তোমরা এসেছো। তোমাদের থেকেই আবার আসবে তোমাদের উত্তরপুরুষ। সৃষ্টি এইভাবেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। আজ যে চৈত্র মাসে ঝড়-বৃষ্টি দেখছ, মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি শুনছ—গত চৈত্রেও

তেমনই হ'য়েছিল। আবার তোমার পূর্বপুরুষেরাও চৈত্র মাসেই সেই একই ভাবে মেঘের গর্জন শুনেছিল, বৈশাখী ঝড় প্রত্যক্ষ করেছিল। এইভাবে প্রকৃতিও আবর্তিত হয়ে চলেছে। আর সেই আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলেছে জীবজগতের সৃষ্টি-লীলার খেলা। একের বিনাশ থেকে অন্যের উদ্ভব। বর্তমানের বিনাশ থেকে ভবিষ্যতের সৃষ্টি। জীবন থেকেই মৃত্যু, আবার মৃত্যু থেকেই জীবন। জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক নিয়েই যখন জগৎ, তখন এ জগতের সকল বিষয়বস্তু, সকল কার্য-কলাপ-গুলোও সেইরকমই হবে। সেটাই স্বাভাবিক।

ধ্বংসের মধ্যেই নবসৃষ্টির বীজ নিহিত।

আমি বুঝি প্রকৃতির নীতি, সমতার নীতি। আমি বুঝি বেদের নীতি, সাম্যের নীতি।—এক কথায়, যা চিরন্তন সত্য, তাই আমি বুঝি। আর বুঝি সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিপ্লব অর্থাৎ গঠনমূলক সংগ্রাম। ধ্বংস করাই বিপ্লবের শেষ কথা নয়। একটা মহৎ কিছু গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

স্বজনকে রক্ষা করতে যেমন আমরা বদ্ধপরিকর, আমাদের সমাজকে রক্ষা করার জন্যও তেমনি বদ্ধপরিকর হতে হবে। তোমার পরিবারের পক্ষে মশা-মাছি ক্ষতিকর, সংক্রামক ব্যাধির বাহক—সেজন্য তুমি তাদের বিনাশ করতে দ্বিধা করছ না। এটা তোমার পরিবারের মঙ্গলেরই জন্য। সমাজ হচ্ছে তোমারই একটা বৃহৎ পরিবার। তাকে রক্ষা করার জন্য তাব ক্ষতিকর জীবাণুগুলিকে, সংক্রামক রোগের বাহকগুলিকে মশা-মাছির মত নষ্ট করতেই হবে। তবে একটা কথা কি জান? যে কোন কাজের আগে সব সময় warning দিতে হয়। সংশোধন করতে হলেও সাবধান করতে হয়। আদি বেদেও বিপ্লবের আগে সাবধানসূচক বাণীর কথা বলছে। বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি চর্চা করলে দেখতে পাবে—সব জায়গায়ই বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। বিপ্লবের আগে সাবধান করে দেওয়াও হয়েছে। সেই সাবধান-বাণী শুনে যখন কেউ নিজেকে সংশোধন

সংশোধন করতে হলেও আগে সাবধান করতে হয়।

করে নিয়েছে, তখন তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা হয়েছে। যখন তা নেয়নি, তখনই শয়তান-শোষক হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে, যুগে যুগে বেদের সমর্থকরা আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজকে অত্যাচার, কুসংস্কার ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবই করে এসেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সেই রকম একটি বিপ্লবেরই কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারীদের বিনাশ করে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই অস্ত্র ধরেছিলেন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। সে যুদ্ধের আগে তিনি নিজে দূত হয়ে দুর্যোধনের সভায় গিয়ে তাদের সাবধানও করে দিয়েছেন।—যখন সে তাঁর কথা শোনেনি, তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বলরাম তাঁর হালের সাহায্যে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজাদের রাজধানীশুদ্ধ উৎপাটিত করে দিয়েছেন। তাতে কি কৃষিবিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর পরম-আত্মীয় মাতুল কংস পর্যন্ত ক্ষমা পায় নি। শ্রীরামচন্দ্রের কার্যবিধি বিশ্লেষণ করলে দেখবে—তিনিও বিপ্লবে বিশ্বাসী। রাক্ষসবংশ অর্থাৎ যারা সকলের রক্ত শুষে খায়, সেই শোষকশ্রেণীর কবল থেকে ধরিত্রীকে উদ্ধার করার জন্যই অস্ত্র ধরেছিলেন, দুর্নীতিপরায়ণ রাবণকে বধ করেছিলেন, অত্যাচারী বালিকে দমন করেছিলেন। সকল ক্ষেত্রেই আগে সাবধানও করে দিয়েছেন।

মহাবীর তার বিপুল বাহিনী নিয়ে রামকে সাহায্য করায় তাঁর পক্ষে অন্যায় ও অসত্যকে বিনাশ করে ন্যায়, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছিল। মহাবীর আর তার বাহিনী জনগণের প্রতীক, গণশক্তিরই প্রতীক। জনগণ সাড়া না দিলে বিপ্লব কখনই সার্থক হয় না। জনগণকে জাগাতে হলে তার সহানুভূতি আকর্ষণ করা আগে দরকার। বিপ্লবের সেটাই প্রথম কথা।—আর এক মহাবিপ্লবী বিভীষণ। সমাজে এদের মত ব্যক্তি খুব কম, যারা রাক্ষসদলের

জনগণকে জাগাতে হলে তার সহানুভূতি আকর্ষণ করা আগে দরকার। বিপ্লবের সেটাই প্রথম কথা।

মধ্যে থেকেও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি। নীতি ঠিক রেখেছে। জাতি-গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে নি। আগেই বলেছি, রাক্ষস বলে কোন আলাদা জাতি বা গোষ্ঠী নেই। সেটা হচ্ছে একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণী, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের বুকের উপর বসে সমাজের রক্ত শোষণ করে চলেছে, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের সঞ্চয় ও সম্পত্তি বাড়িয়েই চলেছে। এই রাক্ষসের দল আজও আমাদের সমাজকে ঘিরে আছে। আজও তারা আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে শাসনের নামে শোষণ করেই চলেছে। এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে বিপ্লবেরই প্রয়োজন।

বেদ এমন একটি আধার যা থেকে মনের, দেহের, ব্যক্তির, সমাজের সব রকম খোরাক মেলে।

আমাদের হাজার হাজার বছর পূর্বের আদি বেদ এমন একটি জ্ঞানের আধার, যার থেকে সকলেই সব রকম খোরাক গ্রহণ করতে পারে—কি মনের, কি দেহের, কি ব্যক্তির, কি সমাজের। মনের বা দেহের বিকাশ সাধন করতে চাও—বেদ অধ্যয়ন কর; ব্যক্তির বা সমাজের যাবতীয় উন্নতি সাধন করতে চাও—বেদ চর্চা কর। দেখবে, তার থেকেই সকল কিছুর ফরমুলা পেয়ে যাবে। এই বেদের সাম্যবাদভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যারা যারা চেষ্টা করছে, তারা যে দলেরই হোক, আমি তাদের সঙ্গে হাত মেলাব।

প্রশ্ন :—আপনি তো বার বার বিপ্লবের কথা বলছেন, কিন্তু কোন্ পথে বিপ্লব আসবে—তা তো বুঝতে পারছি না। এখানে-ওখানে বিপ্লবের নামে যা হচ্ছে, তা বেশীরভাগই জনগণ মেনে নিতে পারছে না। এমন একটি বিপ্লবের পথের নির্দেশ দিন, যে পথে গেলে সকলকার সমর্থন ও সহানুভুতি পাওয়া যাবে।

উত্তর :—প্রকৃতির এমনি একটি নিয়ম যে, আগুন লাগলেই বাতাস আসতে থাকে। তেমনি দেশে যখন হাহাকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন আপনা-আপনিই unity-র একটা দানা বাঁধতে থাকে। সেই unity তখন অন্যায়, সংস্কার, দেশদ্রোহিতা,

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ধর্মশাস্ত্রেরই কথা—অসুরের অত্যাচারে ভগবান নিজহাতে অস্ত্র ধারণ করলেন, দেশদ্রোহী অসুরদের দেশ থেকে নিপাত করে দিলেন। আজও আমাদের দেশে দেবদেবতার মূর্তির হাতের অস্ত্রগুলো খুলে রাখে নি। যারা সমাজ ও দেশের ক্ষতিকারক, বৃহত্তম স্বার্থের জন্য তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। হয় সবাই একত্রিত হও, আর না হয় যারা পথে আসবে না তাদের পথে আনার উপায় বের কর। সব দেশেই এই এক নিয়ম। যারা bold step নিতে পেরেছে তাদের হাতেই ন্যায়ের দণ্ড এসেছে। এই operation খুন করার জন্য নয়, সংশোধন করার জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য।

যারা আমাদের সমাজ ও দেশের ক্ষতিকারক, বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওই step দেশ ও জাতির ক্লেদকে বা'র করে দিয়ে তাকে নিরাময় করার জন্য। আমাদের দেশে সেটা এখনও হয় নি। রোগে আক্রান্ত, রোগগ্রস্ত দেশ—bold step নিলে একদিনেই সব ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।—শুনতে খারাপ লাগতে পারে। তিনতলায় fan-এর তলায় বসে সাহিত্যিকদের কল্পনায় ছড়া বানানো সহজ—'কি অত্যাচার! কি অত্যাচার! এরা তো এখানে এসে এরকমই করবে।' কিন্তু অনাচারের বিরুদ্ধে ওই আচার বা আচরণ অত্যাচার নয়। এতে নৃশংসতার সমূহ চেহারা থাকলেও ভুল যেন না হয়—দস্যুর হাতে অস্ত্র নয়, চিকিৎসকের হাতে অস্ত্র। আমাদের শাস্ত্রমতে দেবদেবতার হাতে অস্ত্র; তাঁদেরই নির্দেশ—'অসুর দমন কর, শত্রুকে বলি দাও।'

Evacuation-এর সময় বর্মার পথে দলে দলে যারা আসছিল, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের সন্তানদের, মা-বাবাকেও ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ইচ্ছে করে কেউ ফেলে রেখে আসেনি; অতি দুঃখে, মনোকষ্টতেই ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, পরিবারের একজন-দু'জনের জন্য সারা পরিবার শেষ হয়ে যাবে—এই ভাবনাতেই তারা ফেলে

রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এটা নৃশংসতা নয়, অবিচার নয়—অবস্থার বিপর্যয়ে, বৃহৎ প্রয়োজনে ও স্বার্থে সবই সম্ভব। আজ ভারত ও পৃথিবীর সবাইকে যদি আমরা একান্নভুক্ত পরিবার হিসাবে ভাবি, আমাদের বেঁচে থাকার ও চলার পথে ওইরকম মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য সব নিঃশেষ হয়ে যাবে—এটা তো ঠিক সমীচীন নয়! তখন বাধ্য হয়ে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। ওই কিছুসংখ্যক ব্যক্তি সবকিছুর মূলে তখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তারা আপনজন—এক রক্তেরই, আমাদেরই তারা মা-ভাই-বোন। বৃহৎ স্বার্থে, অত্যাচারের মত হলেও, অবিচারের খাতায় পড়ে না,—বিচারেই সেটা হয়। কিছু সৈনিক শত্রুর ব্যূহে ঢুকেছে,—ধরা পড়ার আগে নিজেরাই নিজেদের গুলি করে মেরে ফেলল। কারণ, ধরা পড়লে দেশের ক্ষতি হতে পারে—এটা জেনেই একাজ করেছে। এটা অত্যাচার বা অবিচার নয়।—যে গুলি করলো, বৃহত্তর চিন্তাতেই তা করলো।

এক কথায় জাতির শত্রু অবিলম্বে নিপাত হওয়ার প্রয়োজন। ঘরে ডাকাত ঢুকেছে—আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে মারে। ওটা নৃশংসতা বা অত্যাচার নয়—বিচারই। আমাদের সাম্য, স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার অন্তরায় যারা, তাদের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে পথ পরিষ্কার করতেই হবে। এ রকম না হওয়া পর্যন্ত কোনদিনই সাম্য এবং মুক্ত অবস্থা আসবে না, স্বাধীন বলা যাবে না। দেব-দেবতার অস্ত্রগুলো তাঁদের হাত থেকে সন্তানের হাতে আনতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। যে সাম্যমূর্তির ধ্যান-ধারণা এতকাল করে আসছ, সেই সাম্যবাদটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সাম্যবাদ প্রকৃতিগত বাদ; কারও ব্যক্তিগত বাদ নয়—জীবজগতের সবার।

মনে রেখো—বেঁচে থাকা, বাঁচিয়ে রাখাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় কাজ। কিভাবে বাঁচা যায়, বাঁচান যায়—সবাই মিলে তারই চিন্তা কর। খণ্ড খণ্ড ধর্মাচার আর নানারকম অনুষ্ঠানের ফলেই আজ দেশে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। তথাকথিত রাজনীতি এসে

তাতে আরও কলঙ্কের কালি লেপন করেছে। জাতি আজ নীতিভ্রষ্ট, সমাজ আজ দিশেহারা। যে কোন পথে—প্রেম, ভালবাসা বা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এদের এক করাই আজকের দিনের কর্তব্য। জাতিকে এক করার, সমাজকে উন্নত করার অনেক নির্দেশই বেদ আমাদের দিয়েছে। বিপরীত-বুদ্ধিসম্পন্নরা বিপরীত চিন্তা করে বিপথে টেনে সকলকে বিভ্রান্ত করছে, সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। সমাজ আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সেবা করে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। নাম কেনার জন্য সেবাকার্য করতে গেলে ভুল ক'রবে—যেটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে। মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, এদের সেবা করতে গেলে কোন দলের প্রয়োজন হয় না, নাম কেনার চিন্তাও আসে না। সেবার চিন্তাটাই সেখানে থাকে প্রবল। সেইরকম নিজেদেরই বৃহৎ পরিবারের কাজ ক'রছ—এই চিন্তা নিয়েই কাজে নাম।

আমাদেব দেশ একদিন বিপ্লবের দেশ ছিল। আজকের সমাজ সেদিন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। একদিন আমাদের দেশে শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরার কোন অভাব ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল তাদের নীতি। আর আজ না খেয়ে লোকেরা মরছে—তবু সংগ্রাম করছে না। এই হচ্ছে আজকের দেশের পরিণতি।

সমাজকে বিষমুক্ত করতে হলে সেই আদি বেদকেই তুলে ধরতে হবে।

আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে খাওয়া তারা ভাল মনে করছে, কিন্তু খাওয়া-পরার জন্য লড়াই করাটা তাদের কাছে পাপ। এই দেশে বিপ্লব জাগাতে হলে শুধু 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চিৎকার করলে হবে না। কেন হবে না, তার কারণ আমি অনেকবার বলেছি। ছোবলে বিষাক্ত হয়ে গেছে দেশ। সেই বিষকে ছোবল দিয়েই বার করতে হবে। যে বেদ ছিল যুক্তি ও জ্ঞানের আধার, স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে সেই বেদের বাণী বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলেই আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমাজকে বিষমুক্ত করতে হলে সেই আদি বেদকেই সামনে ধরতে হবে।

বেদের বেত্রাঘাতেই সমাজের বিষ ছাড়াতে হবে। আজ দেশে সোনার দাম আর চালের মণের দাম এক হয়ে যেতে বসেছে। তেল ও ঘিয়ের দাম এক। শয়তানের প্রভাব কতটা হলে এগুলো হতে পারে! শয়তানকে দমন করাই হলো তোমাদের আজকের কাজ। ভারতবাসীর রক্তে আজও বিপ্লবের বীজ আছে। তাদের আবার বিপ্লবমুখী করতে হলে প্রথম কাজই হলো—জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে হ'লে, তাদের যারা ক্ষতি করছে, সমাজের সেই ক্ষতিকর জীবাণুগুলোর সন্ধান দিতে হবে। শিকারী চায় শিকার করতে। শিকারীকে শিকার ধরিয়ে দিলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।—এটাই রীতি।

আগেকার দিনে দেশকে, জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিপদের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানেই রক্ষীবাহিনী রাখা হ'ত। পাহাড়, জঙ্গল, সাগর থেকে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তুরা এসে ছাগ, গাভী, মানুষ ইত্যাদি খেয়ে ফেলত। এই হিংস্র পশুদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই শিকারীদের পাহারা রাখা হলো। শিকারীদের অস্ত্রে অনেক হিংস্র জন্তু খতম হলো. আর বাকীরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে তাদের উৎপাতও বন্ধ হলো, মানুষরাও শান্তিতে বসবাস শুরু করল। আজকের সমাজও অনেক হিংস্র জীবের দ্বারা আক্রান্ত। মানুষের বেশে এই হিংস্র জীবেরা নানাভাবে আজ সমাজকে গ্রাস করতে আসছে। সাথে সাথে তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সমাজের প্রতিটি বিভাগ বিষময় হয়ে উঠেছে। আজকের বিপ্লব হবে—ঐ হিংস্র জীবদের গ্রাস থেকে সমাজকে উদ্ধার করা। তার জন্য প্রথম কাজ হবে—হিংস্র জীবের ঘাঁটিগুলোকে খুঁজে বার করা।

সমাজে ভেজাল-কারবারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

আমি শুধু কয়েকটার ইঙ্গিত দিচ্ছিমাত্র।—প্রথমে দৃষ্টি দাও ভেজালের দিকে। যে দেশে একদিন এক পয়সা দু'পয়সায় খাঁটি দুধ ঘি পাওয়া যেত, আজ সেই দুধ ঘি গেল কোথায়? সব সেই হিংস্র জীবেরা শুষে নিয়েছে। আজকাল তেল, ঘি, দুধ, আটা, ময়দা, চিনি, এমনকি ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল মিশিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে।

এই ভেজাল-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে হবে তোমাদের সংগ্রাম। খুঁজে খুঁজে বা'র কর তাদের। তারপর এমন সাজা দাও, যাতে তারা ভেজালের চিন্তাও আর করতে না পারে।

তারপর যাও বিভিন্ন অফিসে, স্কুলে, কলেজে। খুঁজে দেখ—সেখানেও ভেজাল। ঘুষ ছাড়া আজ যেন কারুর আর কোথাও গতি নেই। গুণের আদর নেই, যোগ্যতার দাম নেই, পরিশ্রমের মূল্য নেই। যে ঘুষ দিতে পারল, তারই সকল জায়গায় অগ্রাধিকার।—এগুলো বন্ধ করতে হবে। ঘুষ যে নেবে, আর ঘুষ যে দেবে—দুজনকেই হাত-পা বেঁধে সাজা দিতে হবে। যেখানে দেখবে পক্ষপাতিত্ব, সেখানেই হামলা করবে। তোমরা দেখবে, যাতে সমাজের প্রতিটি বিভাগে সকলেই সকলের সঙ্গে সমান সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহার করে। কেউ যেন অবহেলিত না হয়।

ঘুষখোরদের সাজা দেবে; পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দেবে না।

সমাজের চরম ক্ষতিকারক হলো পুঁজিবাদীরা। বেদ বলেছে—এরাই দেশের পরম শত্রু। দেশের সমস্ত অভাবের মূল কারণই হলো ওরা। যে দেশে ফসল ছিল অফুরন্ত, আজ সেই দেশের আলো, হাওয়া, জল, মাটি, সবই তো ঠিক আছে—গাভীও আছে, জনও বাড়ছে, জমিও বাড়ছে।—তবে ফসল গেল কোথায়? নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পুঁজিবাদীরা খাদ্যকে এক জায়গায় আটকে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে, আর বাজারদর বাড়াচ্ছে। এদের কখনই ক্ষমা করবে না। পুঁজি বন্ধ কর—দেখবে জনগণ খেয়ে-পরে বাঁচবে। তখনই তাদের সহানুভূতি পাবে।

পুঁজিবাদীদের কখনও ক্ষমা করবে না।

দেশের লোকের খাদ্য-বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে যাতে শিক্ষা পায়, সেই দিকেও নজর দেবে। আজ শিক্ষা-বিভাগেও গলদ ঢুকেছে। শিক্ষাকে নিয়েও ব্যবসা চলছে। এখানে ওখানে সব রাতারাতি স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে, অথচ দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে শিক্ষা পেল কিনা,

সেদিকে তারা নজর দিচ্ছে না। স্কুলের বেতন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছুই আছে। সাধারণ লোক কি করে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে? তারপর বই নিয়ে, খাতা নিয়ে ব্যবসা চলছে; এমন কি প্রশ্ন এবং পরীক্ষার নম্বর নিয়েও ব্যবসা চলছে। তোমরা সমস্ত স্কুলে স্কুলে চলে যাও এবং এগুলো বন্ধ কর। দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা কর। হাসপাতাল ও জেলের ভেতরকার বিবরণ যদি খুলে বলি, তবে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠবে, মাথায় খুন চাপবে। কিন্তু খুন করার দরকার নেই—অপারেশন করে তোমরা ক্লেদগুলো বা'র করে দাও।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের দুর্নীতি দূর কর।

আমাদের দেশের বেশীরভাগ হাসপাতালগুলো দেখলে দুঃখে বুক ফেটে যায়। রোগীদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার, অবহেলা তো আছেই। তাদের ভাল করে ঔষধ-পথ্য পর্যন্ত দেওয়া হয় না। খোঁজ করে দেখ, এদের জন্য যে সমস্ত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে, সেগুলো কোথায় যাচ্ছে।—তারপর তার বিহিত কর।

তারপর কর্পোরেশনের দিকে তাকাও। তার তো প্রতিটি ইটে সেপ্‌টিক ধরেছে। চামড়া, মাংস তো কেটে বাদ দিতেই হবে, হাড় পর্যন্ত চেঁছে ঠিক করতে হবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে কর্পোরেশনে কত টাকা উঠছে, কত রকম কন্ট্রাক্টে টাকা আসছে—সে সমস্ত একত্র করলে সমস্ত বাংলা দেশের খরচা চলে যায়। কিন্তু সে টাকা যাচ্ছে কোথায়? চারদিকে তাকালে কর্পোরেশন কিছু কাজ করছে বলে তো মনে হয় না। এর একটা বিহিত কর। জনগণ যখন দেখবে রাস্তাঘাট ঝক্‌-ঝক্‌ করছে, যানবাহন ঠিকমত যাচ্ছে, সাধারণ লোকেরা basic needs-গুলো ঠিকমত পাচ্ছে, তখন তোমাদের উপর সহানুভূতি তাদের আপনিই জেগে উঠবে।

কর্পোরেশনের অনাচার রোধ কর।

পক্ষপাতিত্বের গন্ধ যেখানে পাবে, সেখানেই প্রতিবাদ জানাবে। দেখবে, সংবাদপত্রগুলো যেন নিরপেক্ষ হয়। সংবাদপত্র হচ্ছে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয়। তুলাদণ্ডের মত তাদের বিচার হবে সমান। তারা অনাবশ্যক কাউকে নীচে নামাবে না বা উপরে তুলবে না। সেখানেও তোমাদের অভিযান চালাও। দেখ, তারা ধনী-দরিদ্র, দলমত-জনমত নির্বিশেষে সকলকার খবর নিরপেক্ষভাবে দিচ্ছে কিনা। যদি দেখ, কোন পত্রিকা কারুর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাচ্ছে, পক্ষপাতিত্ব করছে, নিজেদের খেয়ালখুশি মত সংবাদ পরিবেশন করছে, তখন সেই সংবাদপত্রকে দেশে চালু হতে দেবে না।

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখবে।

বিচার ক'রে দেখবে, রাজনীতিক দলগুলি সত্যই দেশহিতের কাজে লেগেছে কিনা। যদি দেখ—মুখেই তারা দেশের কল্যাণের কথা বলছে, কাজে কিছু নয়, তৎক্ষণাৎ তাদের জঞ্জালের মত দূরে ঠেলে দেবে।

মেকী রাজনীতিক দলগুলিকে জঞ্জালের মত দূরে ঠেলে দেবে।

ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা তো বহুবার বহুপ্রসঙ্গে বলেছি। তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে দূত পাঠিয়ে দাও। হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে, সরকারী বিভাগে, প্রাইভেট লিমিটেডে—সর্বত্র তোমরা লক্ষ্য রাখ, কে কোথায় কিভাবে সমাজকে বিষাক্ত করছে। সেগুলোর লিষ্ট তৈরী কর। তারপর এক একটি ধ'রে ধ'রে বিহিত শুরু কর। জনসাধারণকেও হ্যাণ্ড-বিলের মাধ্যমে সবকিছু জানিয়ে দাও। দেখবে, তোমাদের জন্য জনগণের সহানুভূতি আপনিই জেগে উঠবে। তারা নিজেরাই তখন আরও কত গলদের গোপন খবর তোমাদের জানাবে। নেশাগ্রস্ত হয়ে তারা তখন চারিদিক থেকে দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহ করে তোমাদের সরবরাহ করবে। তোমাদের কাজের সুবিধা হয়ে যাবে।

সমাজের বিষাক্ত অণুপরমাণুগুলোর একে একে বিহিত কর এবং জনসাধারণকে তা জানিয়ে দাও।

তারপর প্রতিবিধানের জন্য যখন নামবে, তার আগে বেদের নির্দেশ

অনুযায়ী প্রথমে সকলকে দু'একবার সাবধান ক'রে দেবে। তাতেও যদি না শোধরায়, তখন কাজে নেমে যাবে। দেখবে, কাউকে তোমাদের আলাদাভাবে ডাক দিতে হবে না। সকলে নিজে থেকে এসে তোমাদের সাথে যোগ দেবে। শিকারী শিকারের সন্ধান পেয়েছে—এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপ্লব আপনিই জেগে উঠবে।

শিকারী শিকারের সন্ধান পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখবে — নদীর এপাড় ভাঙ্গে, ওপাড় গড়ে। আজ যে ভাঙ্গন চলেছে, তা গড়ার প্রয়োজনেই। ভেতরে রোগ থাকলে তা প্রকাশ পাবেই। সমাজ আজ রোগাক্রান্ত, এবার তার ক্লেদগুলো বেরোচ্ছে। শয়তানের স্বরূপ প্রকাশ পেলে শয়তানী দমনের সুবিধাই হবে। তাদের পাখা গজিয়েছে আগুনে পুড়ে মরার জন্য। প্রকৃতির এটাই নিয়ম—যেখানে অতি উত্তপ্ত হয়, সেখানেই ঝোড়ো হাওয়া উড়ে এসে শান্তির বারি বর্ষণ করে। আজ সমাজ উত্তপ্ত। তাই বিপ্লবকে বাহন ক'রে এক মহাশান্তির জলদ নেমে আসছে। তার গর্জনে ঝঙ্কার আছে, বর্ষণে শান্তি আছে, বিদ্যুতের ঝলকানিতে জ্ঞানের আলোক আছে। সে আলোতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হবে, সে বর্ষণে সমাজের ক্লেদ সরে গিয়ে সারে পরিণত হবে। ক্ষেত্র তখন আপনিই তৈরী হয়ে যাবে। বীজ আপনিই এসে উপস্থিত হবে। চারিদিক থেকে মহান শক্তিশালীরা অন্তরাল থেকে নিঃস্বার্থভাবে একাজে আপন মনে সাহায্য করে যাবে।

পরিচিতি

বর্তমান জগতে আমরা ব্যক্তির থেকে বাইরে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্বসংসারকে বুঝবার চেষ্টা করি। আমি যেমন বিজ্ঞানী—সারাজীবন চেষ্টা করছি প্রাকৃতিক রহস্য কিছু ভেদ করা যায় কিনা; সারাজীবন এতেই কেটে গেল। এখানে শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের আপনি একটা বিশেষ রকমের রূপ প্রতিভাত হয়েছে, আপনা থেকে তাঁর মনে বিশ্বের প্রাকৃতিক রহস্য বিশেষরকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।...এভাবে এঁরা আসেন বলেই আমরা অনেক বিপদের ভেতর দিয়েও জাতি হিসাবে টিঁকে আছি।

—বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ভারতের জাতীয় অধ্যাপক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

পরমার্থ সত্যের ৫০ বৎসর ধরে একান্ত অনুসন্ধানী আমি আজ অবশেষে বার্ধক্যে পৌঁছে যা পেলাম, বুঝলাম, যা দু' মুগ্ধ চক্ষু ভরে দেখলাম—সেই পরম বিস্ময়ের বস্তুই ছিল আমার এতদিনের অন্বেষণের ধন। আমি জানি, আমি পৌঁছে গেছি আমার সিন্ধুসঙ্গমের মহাতীর্থে—অসীমের মহাবিস্তারে। ধর্মাচার্য অনেক আছেন, বাগ্মী অনেক দেখেছি, এমন সহজের সন্ধানী অপরূপ বিস্ময় তো আর মানুষের আকারে আগে কখনও দেখিনি! ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে একথা অত্যুক্তি বা প্রশস্তি নয়, স্তবস্তুতি নয়, বাগ্মীতার শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসও নয়। এমন করে তো এতদিন কেউ সন্ধান দেয়নি অন্তরস্থ নিত্য বৃন্দাবনের!

...আজ আমি ভারতের এবং সমস্ত জগতের এক বিরাট পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছি। তোমরা শুনেছ ঐ পারমাণবিক শক্তির কথা,—ধূলিকণার মধ্যে জড় বস্তু—matter-এর মধ্যে যার হয়েছে আবিষ্কার।—ঐ শক্তি ধ্বংসও বটে, কল্যাণও বটে। ও গুটিয়ে সংহত হ'য়ে সমাধিতে জড় ধূলো হয়ে আছে।...সেই ঐশী শক্তির সংস্কৃত তনু, সেই দীপ্ত বিরাটের ক্ষুদ্র হয়ে গুটান তনু। জানি না কি উদ্দেশ্যে তাঁর ঐশী শক্তি বিভূতি তিনি সম্বরণ করে রেখেছেন।

আমি একবার লিখেছিলাম 'বসুমতী'তে যে, "এমন একটা দীপ্ত যুগ আসছে—যাতে সমস্ত জগৎ ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেই যুগপুরুষ একজন আছেন। তিনি এসে দাঁড়ালেই আপনি প্রমাণ হয়ে যাবে, তাঁকে আর কষ্ট করে চিনিয়ে দিতে

হবে না।"...বালক ব্রহ্মচারীজী এই রকম অপূর্ব জিনিষ। উনি সাধক নন, উনি যোগীঋষি নন। আমরা বহু কষ্ট করে এক আনা পাই, ওঁরা ষোল আনা নিয়ে আসেন। ওঁদের কথাই আলাদা।

—অগ্নিযুগের বিপ্লবী ঋষি স্বর্গীয় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারীর অনুভূতিসম্পন্ন চোখে তত্ত্ব আপনি স্ফুরিত হয়। তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কীয় মহাবাক্যগুলির ওপর শঙ্করাচার্যের মত একদিন ভাষ্য হবে—ইহাই আমার ধারণা।

—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার।

এইটুকু বুঝি, বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করলে বিনা ভক্তিমার্গে জ্ঞানযোগে সেই আত্মস্বরূপ শাশ্বত পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ হয়। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছে—যাকে 'আমি' বলি স্থূল কথায়, তাকে উপলব্ধি করা হয়ে গেছে।

—বারাণসী সংস্কৃত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী।

বালক ব্রহ্মচারীজী সকল প্রকার সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত একজন অসাধারণ পুরুষ। তাঁহার নিকট আমি ভক্তিনম্রভাবে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

—জগৎবিখ্যাত দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ।

শ্রীবালক ব্রহ্মচারী অতিশয় গভীর স্তরের মানুষ। তাঁহার চিন্তাধারা ভাবসম্পদে এমন সমৃদ্ধ যে উহা মানবের মানসভূমি উর্বরা করিয়া তুলিতে ও পুরাতন সমাজ-গঠন ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিতে পাবে।

—বিশ্ববিশ্রুত বৈপ্লবিক ও দার্শনিক স্বর্গীয় মানবেন্দ্রনাথ রায়।

বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এমন তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন, যাহা একমাত্র সর্বজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। যতই বিচার করি, ততই আমরা তাঁহার ভগবত্তায় নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাই। তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিলে মানুষের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের কোন কথাই উঠে না।

—লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক স্বর্গীয় অনন্তকুমার ন্যায় তর্কতীর্থ।

ভগবান বুদ্ধের বাণী যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, আজ তেমনই দেখছি বালক ব্রহ্মচারী বাবার আধ্যাত্মিক শক্তি ও বাণী শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নয়, খৃষ্টান ও মুসলমানদের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

—স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

(শ্রীশ্রীঠাকুরকে পেয়ে) আমি আমার রামকে ফিরে পেয়েছি। আমার সকল স্বর-সাধনা সার্থক।

—এশিয়ার সুরসম্রাট ওস্তাদ অলাউদ্দিন খাঁ।

(করকোষ্ঠি বিচারে)…শ্রীহস্তে শঙ্খ, চক্র ও পদ্মচিহ্ন আছে। মহাপুরুষ ও যুগাবতারগণের হস্তে এই সকল চিহ্ন থাকে। প্রবল প্রব্রজ্যা যোগ আছে। বৃহস্পতি ও রবির ক্ষেত্র শুভ থাকায় পরাজ্ঞানে চূড়ান্ত অবস্থা, অসাধারণ প্রতিভা দেখা যাইবে। বৃহস্পতি স্বতঃস্ফূর্ত—অফুরন্ত জ্ঞানের কারক। রবি যশ ও প্রতিভার কারক। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই জ্ঞানের সংক্রমন দেখা যাইবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত দ্বিত্রিংশৎ (৩২) মহাপুরুষের লক্ষণও দেখা যাইতেছে।…শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রিতাপদগ্ধ আমাদিগকে রক্ষা ও কৃপা করুন।

—পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী, সাংখ্যাদিতীর্থ, ষড়দর্শনাচার্য—অধ্যাপক, বেদান্ত চতুষ্পাঠী।

ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠ দান পরমার্থ সম্পদ।…জগতের সর্বত্র, বিশেষতঃ ভারতে এবং এই তপোভূমি বাংলায় যুগে যুগে অপার্থিব অতীন্দ্রিয়ের ডাক সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রাণগুলিকে নিশির ডাকের ন্যায় ডাকিয়া পথে বাহির করিয়াছে।…

এই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায়, আজিকার rational যুগে গৌরাঙ্গদেবের পরম বৈষ্ণবকুলে জন্মিয়া এক জীবনবেদের উদ্গাতা অতি দুঃসাহসের কথা বলেন। তাঁহার সাধনবেদে পাপ নাই, পুণ্য নাই; সুকৃতি নাই, দুষ্কৃতি নাই; আছে খরস্রোতা অনন্তমুখী জীবনের জোয়ার।…বাস্তব জীবন-সাধনার এই নূতন গৌরাঙ্গের শাস্ত্রে মন্ত্রে দেবতা নাই—'সকল তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমারই

সকল জ্ঞানের পরম জ্ঞান হইতেছে আত্মজ্ঞান, সকল পূজার সার হইতেছে—আপ্তকামের আত্মরতি অবস্থা।'

পৃথিবী যখন হিংসা, দ্বেষ, পাপ ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, দিকে দিকে যখন লাঞ্ছিত মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া আকাশ-বাতাসকে ব্যথিত করিয়া তোলে, ঠিক তখনই আবির্ভূত হন এমনি এক একজন যুগাবতার মহামানব।—এই সত্য পৃথিবীর শাশ্বতকাল ধরিয়া প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে।

বালক ব্রহ্মচারীর চেহারা চেয়ে দেখবার মত। বীর্যবান ও ঐশ্বর্যবান চেহারা। ঐশ্বর্য বলতে যাঁরা কেবল টাকাকড়ি বোঝেন, এ লেখা তাঁদের জন্যে নয়। প্রাণের ঐশ্বর্যের কথা বলছি। জীবনে কোনও দারুণ আনন্দ পেলে তবেই কারুর মুখে এমন আলো ঝলমল করে। পুরুষালি-দৃপ্ত ভঙ্গী।...ব্যক্তিত্ব অভয়ংকর ও শান্ত।

সন্তানদলের যিনি মধ্যমণি, তিনি সমাজজীবনে এমন এক স্তরের মানুষ যাঁর কাছে ক্ষুদ্রতা, দলীয় স্বার্থ—কোন কিছুরই মূল্য নেই। তাঁর প্রয়াস—জ্যোতির্ময়ের পথে সমাজকে নিয়ে যাওয়া—পথ বাৎলে দেওয়া।....তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আছে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ।—

The 'Santan Dal' which has participated in the civil disobedience demonstrations........is not a political party. Its founder Thakur Balak Brahmachari said that the Santan Dal was out to fight social injustice and re-establish the Vedic principles of equality. This Vedic Samyabad........was different from Communism. The Dal would fight for a social system in which everybody would have sufficient food, free education and free medical treatment. Equal opportunity for all and equal social status based on the dignity of labour were its demands.

The 'SANTAN DAL' is not a political organisation as its distinguished founder announced the other day............They were involved in a struggle for "fundamental rights of citizens and the restoration of democracy"............The Dal is of course more concerned with fighting social injustice and re-establishing the Vedic principles of equality.